বিভূতিভূষন বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রকৃতি। তাঁর বৃত্তি ছিল শিক্ষকতা—কিছুটা কলিকাতায়, বেশির ভাগ গ্রামের বিদ্যালয়েই তিনি শিক্ষকতা করেছেন। তাঁর প্রিয় পাঠ্যবস্তু ছিল ঃ সাহিত্য, ভ্রমণবৃত্তান্ত, আকাশতত্ত্ব, জীবনবিজ্ঞান, উদ্ভিদবিদ্যা, পরলোকতত্ত্ব, ভূগোল, জ্যোতির্বিদ্যা। তাঁর পিতার নাম মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় শাস্ত্রী। যশোরের বনগ্রাম মহকুমার বারাকপুর গ্রামে তাঁদের বাড়ি। মহানন্দ সংস্কৃত পণ্ডিত ও কথকরূপে খ্যাতি লাভ করেন। তাঁর ছিল ভ্রমণের নেশা। তিনি ভবঘুরে উদাসীন প্রকৃতির লোক ছিলেন, সংসারে টান ছিল না, উপার্জনে মন ছিল না। কবিমনের অধিকারী পিতার এইসব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য পুত্র বিভূতিভূষণেও বর্তে ছিল। শেষ নেই তাঁর চলায়, শেষ নেই তাঁর জীবনে। 'অপরাজিত' লেখক বিভূতিভূষণের নিজের ঘোষণা—"সে জন্মজন্মান্তরের পথিক আত্মা, দূর হইতে সুদূরে নিত্য নূতন পথহীন পথে তার গতি। —এই শত সহস্র শতাব্দী তার পায়ে চলার পথ।"

□ উপন্যাস ঃ

১৩২৮ সালের মাঘ সংখ্যা প্রবাসীতে 'উপেক্ষিতা' গল্পের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিভূতিভূষণের প্রথম আবির্ভাব। এই আবির্ভাবকালীন পটভূমিকাটি বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। সে সময়ে কল্লোল পর্বের তরুণ লেখকদের রচনায় প্রথম সমরোত্তর সংশয় ও অস্থিরতা, চাঞ্চল্য ও নাগরিক মনোভাব, নেতিবাদী ও নাস্তিক দৃষ্টিভঙ্গি, রোমান্টিক বিদ্রোহ ও দেশ-জাতি সংস্কৃতির অস্বীকৃতিমূলক মনোভাব প্রাধান্য পেয়েছিল। গোকুল নাগ, বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতিরা ছিলেন এই গোষ্ঠীর অন্যতম লেখক। হামসুন, গোর্কি প্রমুখ পাশ্চাত্য লেখকেরা ছিলেন এঁদের দীক্ষাগুরু। অসন্তোষ ও হতাশা হল তাঁদের সাহিত্যের মূল মন্ত্র। আবেগের পরিবর্তে প্রবল যুক্তিবাদের প্রাধান্য দেখা গেল। কিন্তু এঁদের এই একঘেয়ে হতাশা, সংশয়, জিজ্ঞাসা আর ভঙ্গুর সমাজ জীবনের বুকচাপা কান্না—মানুষের মনে দুর্বহ বোঝা হয়ে উঠল। বিভূতিভূষণ তা উপলব্ধি করে বাংলা কথাসাহিত্যের মধ্যে সমস্ত দুঃখ-বেদনা ও লাঞ্ছনার মধ্যেও অপরাজিত মানবাত্মার আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারের গৌরবগাথার শিল্পরূপ দিলেন। তাই ভারতীয় জীবনবোধ ও শিল্পচেতনার সঙ্গে বিভূতিভূষণের দৃষ্টিভঙ্গির এক আশ্চর্য সঙ্গতি লক্ষ করা যায়। কারণ ভারতবর্ষ কোনদিন দ্বন্দ্ব ও বিপর্যয়কে জীবনের শেষ পরিণাম ও সত্য বলে স্বীকার করে নেয়নি। ভারতবর্ষ ও ভারতীয় সাহিত্যের যে স্থায়ী রস স্নিগ্ধ গভীর শান্তরস তা বিভূতিভূষণের সাহিত্যে স্থায়ী অক্ষরে মুদ্রিত আছে। তাই তাঁর জন্মের শতবর্ষ পরেও তাঁর সাহিত্যের আদর যথেষ্ট। পাঠকরা তাঁর সাহিত্যের মধ্যে খুঁজে পান পল্লীগ্রামের সৌম্য, শাশ্বত, পরিপূর্ণ জীবন ও জীবনসত্যকে।

'পথের পাঁচালী' (১৯২৯) প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে (পিতৃদেবকে উৎসর্গ) বিভূতিভূষণ পাঠক হৃদয় অধিকার করেন। রবীন্দ্র-শরৎশাসিত বাংলা কথাসাহিত্যে বিভূতিভূষণ নিজেকে সেদিন প্রথম আবির্ভাবে যেভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, সেই প্রতিষ্ঠা থেকে তাঁকে আর কেউ বিচ্যুত করতে পারেনি। 'পথের পাঁচালী'র বিশেষত্ব প্রকৃতিপট নির্মাণে নয়, পাঁচালীকারের অধিকতর সানুপুঙ্খ তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণে। তাছাড়া 'পথের পাঁচালী'র একমাত্রতা এবং অনন্যতা তাঁর কেন্দ্রীয় চরিত্র নির্বাচনে। তাই অপু ও দুর্গা সমসাময়িক তরঙ্গাঘাত থেকে বিচ্ছিন্ন আলাদা জগতের শিশু। 'পথের পাঁচালী' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ

মন্তব্য করেছেন, "বইখানা দাঁড়িয়ে আছে আপন সত্যের জোরে। ....এই গল্পে গাছপালা, পথঘাট, মেয়ে-পুরুষ, সুখ-দুঃখ সমস্তকে আমাদের আধুনিক অভিজ্ঞতার প্রাত্যহিক পরিবেষ্টনের থেকে দূরে প্রক্ষিপ্ত করে দেখানো হয়েছে। সাহিত্যে একটা নতুন জিনিস পাওয়া গেল অথচ পুরাতন পরিচিত জিনিসের মত সুস্পষ্ট।" পথের পাঁচালীর অভিনবত্ব সম্পর্কে প্রমথনাথ বিশী লিখেছেন—"...জানিনা কেমন করে, 'পথের পাঁচালী'রূপ বিচিত্র উপলখণ্ডটি কালস্রোতের ঊর্ধ্বে একটি ক্ষুদ্র ভূখণ্ডের উপর স্থান পেয়ে গিয়েছে। .....বিভূতিভূষণের কাছে বাঙালী পাঠকের কৃতজ্ঞতা এই যে, তিনি এই চিরশিশুর রাজত্বটি নির্মাণ করে ক্ষান্ত হন নি, সেখানে সকলের জন্যই নাগরিকত্ব লাভের অধিকার সংবিধান সম্মত করে দিয়েছেন। যে কেউ প্রবেশ করে বয়সের খোলস খুলে ফেলে সেই রাজ্যের অধিবাসীরূপে চিরশৈশব ভোগ করবার অধিকার অর্জন করতে পারে, যেখানে 'জগৎ পারাবারের তীরে শিশুরা খেলা করে'।" সর্বজয়া-দুর্গা, সর্বজয়া-ইন্দির ঠাকরুণ, সর্বজয়া-অপু এমন করে এর আগে বাংলা সাহিত্যে আসেনি।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আলোচ্য উপন্যাসের অভিনবত্বের স্বরূপ ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেছেন ঃ "ইহার মৌলিকতা ও সরস নবীনতা বঙ্গ উপন্যাসের গতানুগতিশীলতার মধ্যে একটি পরম বিস্ময়াবহ আবির্ভাব। অপুর ন্যায় জীবন্ত ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে চিত্রিত চরিত্র বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে আর দ্বিতীয় নাই। শিশুমনের রহস্যময়তা সম্বন্ধে কাব্যে ও দর্শনে যে সাধারণ উক্তি আমরা শুনিতে অভ্যস্ত, এই উপন্যাসে তাহা পুঞ্জীভূত উদাহরণ ও বিচিত্র প্রমাণের সাহায্যে সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ব্যাপকতা ও গভীর অন্তর্দৃষ্টির দিক দিয়া এই শৈশব-রহস্যের ইতিহাসে ওয়ার্ডসওয়ার্থের Prelude-এর সহিত তুলনীয়—অপুর অধ্যাত্মদৃষ্টির কয়েকটি দৃষ্টান্ত অনিবার্যভাবে Prelude-এ কবির তুল্যরূপ অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। শিশুর মনে যে সোনার কাঠি পরিচিত জগতের তুচ্ছতার মধ্যে এক অলৌকিক মায়ারাজ্য সৃজন করে, বিভূতিভূষণ সেই রূপকথার রাজ্যের রহস্যটি আমাদের আদর্শলোকচ্যুত বয়স্ক অভিজ্ঞতার সম্মুখে বিশ্লেষণ করিয়া তাহার ইন্দ্রজালশক্তি সর্বসাধারণের গোচরীভূত করিয়াছেন। বিশ্লেষণের মধ্যেও যে ইহার অপরূপ মায়াডোর ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয় নাই ইহাই লেখকের চরম কৃতিত্ব।" (বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা)

এই উপন্যাসের অভিনবত্বের কারণগুলি হল ঃ প্রথমত, গ্রাম-বাংলার অতিপরিচিত রূপের মধ্যেও অপরিচয়ের বিস্ময়মাধুরী ও রহস্য-সৌন্দর্যের আবিষ্কার করলেন বিভূতিভূষণ এ গ্রন্থে। দ্বিতীয়ত, গ্রামবাংলার সাধারণ মানুষের জীবনেও যে কি পরিমাণ বিস্ময়কর উপাদান নিহিত রয়েছে তা এই গ্রন্থে দেখা গেল। তৃতীয়ত, বালকের চোখ ও মন নিয়ে একটি বালকের সঙ্গী হয়ে যেভাবে তিনি এই জগৎটিকে দেখলেন তাও অভিজ্ঞতা হিসেবে আমাদের কাছে অভিনব। চতুর্থত, কোনো জটিল সামাজিক সমস্যা ঔপন্যাসিকের উপজীব্য নয়, মানব মনের ছোট ছোট অনুভূতির রহস্যই তাঁর মূলধন হয়েছে। সূক্ষ্ম তুচ্ছ অজস্র জিনিসের ইতিহাস অনুসন্ধান করেছেন বিভূতিভূষণ। পঞ্চমত, অপুকে আশ্রয় ক'রে জীবনের একখানি ধারাবাহিক পাঁচালি রচনায় ব্রতী হয়েছেন ঔপন্যাসিক। গতিশীল পলাতক অনন্তের প্রবাহটি যাতে মুখর হয়ে উঠেছে। পথের অবারিত দীর্ঘতার সঙ্গে পাঁচালির ভারাতুর মন্থরতার সমন্বয় ঘটেছে। ষষ্ঠত, আলোচ্য

গ্রন্থের রচনারীতিও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। বিচিত্র এই শিল্পরীতি, যার বিশ্লেষণ প্রায় অসম্ভব বলা চলে। সাহিত্য রচনার সচেতন প্রচেষ্টা সর্বত্র অনুপস্থিত। আর্ট এখানে যেন গুপ্ত। লেখক যেন অত্যন্ত নির্লিপ্ত ও নির্বিকারভাবে তাঁর দেখা জীবনচিত্রকে এ গ্রন্থে অঙ্কন করেছেন। এ গ্রন্থে প্রতিটি চিত্র, প্রতিটি বর্ণনা তাই স্বভাবানুযায়ী। এ বিষয়ে স্বয়ং বিভূতিভূষণের স্বীকারোক্তি স্মরণযোগ্য। দিলীপকুমার রায়কে একটি পত্রে তিনি জানিয়েছিলেন—"আমি কোনো বড় ঘটনায় বিশ্বাসবান নই। দৈনন্দিন ছোটখাটো সুখ-দুঃখের মধ্যে দিয়ে যে জীবনধারা ক্ষুদ্র গ্রাম্য নদীর মত মন্থর বেগে অথচ পরিপূর্ণ বিশ্বাসের ও আনন্দের সঙ্গে চলেছে—আসল জিনিসটা সেখানে। কোনো কৃত্রিম প্লট সাজানো, প্যাঁচকষা, কৃত্রিম সিচুয়েশন তৈরী করা—আমি মানি না। নভেল কেন কৃত্রিম হবে? প্রতিদিনের অমূল্য দানকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কৃত্রিমতার মালা গাঁথা ও তারই বেসাতি শুধু টেকনিকের বেসাতি হ'য়ে দাঁড়ায়। কোনো সুস্থ, সতর্ক ও অনলস মনের বিভিন্নমুখী কৌতূহল তাতে চরিতার্থ হয় না।" (পরিচয়, প্রথম বর্ষ, মাঘ, ১৩৩৮)

অন্যদিকে বিভূতিভূষণের প্রকৃতিপ্রেম, নিসর্গমুখিতা, সরল সত্যতা 'আরণ্যকে' (১৯৩৯) প্রকাশ পেয়েছে। 'আরণ্যক' 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। 'আরণ্যক' যত না নৈসর্গিক বিস্ময়ের গল্প, তার চেয়ে অনেক বেশি মানবীয় বাস্তবতার কাহিনি। 'আরণ্যক'-এর কথক সত্যচরণ, 'পথের পাঁচালী'র অপু আর এদের সৃষ্টিকর্তা বিভূতিভূষণ রূপে এক সত্তার প্রকাশ। দর্শক সত্যচরণের জীবনে অরণ্য-প্রকৃতির সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে মানুষ। দিগন্তলীন মহালিখারূপের পাহাড় ও মোহনপুরা অরণ্যানীর পটভূমিতে নাঢ়া-বইহারের ও লবটুলিয়ার অরণ্য প্রান্তর বিনষ্ট করে বসতি স্থাপনের কাজটি সত্যের হাতেই নিষ্পন্ন হয়েছিল। তবু এই আরণ্য প্রকৃতিকে সত্য ভালোবেসেছে, সেই সঙ্গে তার মনের মণিকোঠায় সাজানো আছে বহু চরিত্র—এরাই 'আরণ্যক'-এর চরিত্র—ভানুমতী, মঞ্চী, কুন্তী, মটুকনাথ, যুগলপ্রসাদ, রাজু পাঁড়ে, গনোরি তেওয়ারী, দোবরু প্রভৃতি।

তাঁর রচিত উপন্যাসগুলি হল ঃ 'পথের পাঁচালী' (১৯২৯), 'অপরাজিত' (১ম ও ২য় খণ্ড, ১৯৩২), 'দৃষ্টিপ্রদীপ' ('প্রবাসী', ১৯৩৫), 'আদর্শ হিন্দু হোটেল' ('মাতৃভূমি' পত্রিকা, ১৯৪০), 'বিপিনের সংসার' (১৯৪১), 'দুই বাড়ী' (১৯৪১), 'অনুবর্তন' (১৯৪২), 'দেবযান' (১৯৪৪), 'কেদার রাজা' ('মাতৃভূমি', ১৯৪৫), 'হীরা মাণিক জ্বলে' (১৯৪৬), 'অথৈজল' ('প্রভাতী' পত্রিকায় প্রকাশিত, গ্রন্থাকারে প্রকাশ, ১৯৪৭), 'ইছামতী' (১৯৫০), 'দম্পতি' (১৯৫২), 'অশনি-সংকেত' (১৯৫৯), 'অনশ্বর' (১৯৭২)। ছোটদের উপন্যাস ঃ 'চাঁদের পাহাড়' ('মৌচাক' পত্রিকা, ১৯৩৮), 'মিসমিদের কবচ' (১৯৪২), 'মরণের ডঙ্কা বাজে' ('মৌচাক' পত্রিকা, ১৯৪৮)।

'পথের পাঁচালী' ('বিচিত্রা' পত্রিকায় প্রকাশিত) ও 'অপরাজিত' ('প্রবাসী'তে প্রকাশিত) দুখণ্ড—এই তিন খণ্ড একত্রে মহাকাব্যমূলক উপন্যাস। এই তিন খণ্ডে এক কল্পনাপ্রবণ ও অধ্যাত্মদৃষ্টিসম্পন্ন জীবনের ক্রমিক বিকাশের পটপরিক্রমা চিত্রিত হয়েছে। 'দৃষ্টিপ্রদীপ' উপন্যাসে জীবন ও প্রকৃতি বর্ণনার সরসতা লক্ষ করা যায়। 'পথের পাঁচালী'র অপুর সঙ্গে 'দৃষ্টিপ্রদীপ'-এর জীতুর মূলগত পার্থক্য লক্ষ করা যায়। অপু যেখানে বন্ধনহীন, জীতু সেক্ষেত্রে আসক্তিপ্রবণ। জীতু অন্তরে গৃহী হয়েও উদাসীন পথিকের মতো দেশে দেশে ভ্রমণ করেছে।

'আদর্শ হিন্দু হোটেল' আধুনিক যুগের সমস্যাক্ষুব্ধ জীবনযাত্রা থেকে বিপরীত বৃত্তের স্বরূপকে তুলে ধরেছে। রাণাঘাটে হোটেল পরিচালনার ব্যবসায়িক দিকটি ঔপন্যাসিক এখানে মেলে ধরলেও তার মাঝে মাঝে পল্লীজীবনের সুস্নিগ্ধ রূপ এবং ভক্তি-শ্রদ্ধার দিকটি চিত্রিত হয়েছে। হাজারি ঠাকুর ও পদ্ম চরিত্র বেশ জীবন্ত।

'বিপিনের সংসার' উপন্যাসে বিভূতিভূষণ পুরাতন জীবনবৃত্তের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন না করেও এক নতুন মনোরাজ্য নির্মাণ করেছেন। বিপিনের জীবনে দুই বিবাহিতা নারীর প্রভাব এই উপন্যাসে চিত্রিত হয়েছে।

'দুই বাড়ী' উপন্যাসটি স্বপ্নের জলছবি। এই উপন্যাসের নায়ক নিধিরাম মোক্তারি পাশ করে কিছু উপার্জনের আশায় তার বাবার বন্ধু যদু মোক্তারের কাছে উপস্থিত হয়েছে। তার বড় প্রাপ্তির আশা ছিল না, সে অল্পেই খুশি ছিল। নিত্য নৈমিত্তিক অভাব, গ্লানি, দুঃখ দেখে নিধিরাম যখন ক্লান্ত তখন সে পেয়েছে মঞ্জরীর মতো উদারমনা নারীকে। এরপর নিধিরামের জন্মান্তর ঘটেছে। তার জীবনে এসেছে আর এক নারী হৈম। কিন্তু শেষপর্যন্ত সবকিছুই তার স্বপ্ন থেকে গেছে। নিধু জানে, "মধ্যে যে আসিয়াছিল, সে তো দুদিনের স্বপ্ন।"

১৯৪০—১৯৪৪ এই চারবছর ধরে লিখে বিভূতিভূষণ 'দেবযান' উপন্যাসটি শেষ করেন। বিভূতিভূষণ সমকালীন সময়ে তৃতীয় বিশ্বে দেখেছেন বাস্তবে দুঃখভরা দারিদ্র্য লাঞ্ছিত, ঔপনিবেশিক নানা ভাঙনে পর্যুদস্ত সাধারণ জীবনে, জীবনের গতিময়তাকে, বাঁচবার আনন্দকে। তাই তাঁর 'দেবযানে'র কল্পস্বর্গেও খুঁজে পেয়েছেন পার্থিব জীবনের প্রেম-ভালোবাসা ও দুঃখ-আনন্দকে। কারণ বিভূতিভূষণ দেখেছিলেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও পঞ্চাশের মন্বন্তর জনিত ক্ষুধা ও অনাহারকে ও তজ্জনিত মৃত্যুকে। বস্তুত ঐ মৃত্যু ও আসন্ন অবক্ষয়ের পটভূমিকায় 'দেবযানে'র পরিকল্পনা। তাছাড়া তাঁর চারপাশে তিনি দেখেছিলেন দারিদ্র্য-ক্ষুধা-মৃত্যুর মিছিল। এ থেকে বাঁচতে হলে চাই মুক্ত মন ও মানুষের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা—যা তিনি 'দৃষ্টিপ্রদীপ'-এ তুলে ধরেছেন। বিভূতিভূষণ মনে করতেন, এই যে অখণ্ড জীবনপ্রবাহে আসা ও যাওয়া, এতেই আনন্দ—"আমি এই যাওয়া-আসা স্বপ্নে ভোর হয়ে বড় আনন্দ পাই।" 'দেবযান' এই আসা-যাওয়ার কাহিনি। তাই যতীন গরীব ঘরে জন্মে দুঃখ প্রকাশ করেনি, কারণ গরীব ঘরে মাতৃস্নেহ-ই তার প্রধান মূলধন। পুষ্পও বলেছে, "কলকাতায় আসতে পারি নে, কষ্ট হয়। উঃ দেখেচ কেমন কালো কালো কুয়াশার মতো জিনিস। মানুষের অর্থলোভ, বিলাসিতা, নানারকম খারাপ চিন্তা, সকলের ওপর লোভ—এ সব ধরনের কালো কুয়াশা সৃষ্টি করেছে। ওর মধ্যে দিয়ে আসতে দম বন্ধ হয়ে যায়, যেন সব বড় শহরেই এরকম দেখেছি—এখানে মানুষ সব ভুলে শুধু ভোগ নিয়ে আছে।" উপন্যাসে যতীন তাই মৃত্যুর এপার থেকে স্ত্রী আশার দুঃসহ অবস্থা দেখে, যখন তার সব বিস্বাদ লাগে, তখনই মনে হয়, "এই হয়তো নরক"। আসলে লেখক প্রেমহীন ভালোবাসাহীন পৃথিবীকেই নরক বলে মনে করেছেন। প্রেম ও ভালোবাসাই এই নরক থেকে মুক্তি দিতে পারে বলে বিভূতিভূষণ মনে করেন।

তাঁর 'অনুবর্তন' উপন্যাস শিক্ষক সমাজের জীবনচর্যার কাহিনি। বিভূতিভূষণ শিক্ষক ছিলেন বলেই তাঁর শিক্ষক জীবনের অভিজ্ঞতায় ভরা এ উপন্যাস। শিক্ষকের আদর্শ,

কর্মপন্থা, টিউশনি প্রভৃতি বাস্তব চিত্র তিনি এই উপন্যাসে এঁকেছেন। শিক্ষকদের সামাজিক অবস্থানকে ও তাদের অন্তঃসারশূন্য অর্থনৈতিক পরিস্থিতিকে অনেকটা রিপোর্টারের মতো রূপ দিয়েছেন লেখক।

'ইছামতী' বিভূতিভূষণের সাহিত্য জীবনের শেষ পর্বের রচনা। বিংশ শতকের প্রথমার্ধের ইছামতী নদীশাসিত গ্রামবাংলার এক সার্থক চিত্র এই উপন্যাসে লিপিবদ্ধ। 'ইছামতী' একটি বস্তুনিষ্ঠ সামাজিক দলিল। সুন্দরী ইছামতীর কূলে সুন্দরে-অসুন্দরে মিশ্রিত যে ঘটমান জীবননাট্য তা-ই চিত্রিত হয়েছে উপন্যাসে। এটি একটি মহাকাব্যিক উপন্যাস। শুধু বিশালতার দিক থেকে নয়, বিভূতিভূষণের তিনটি মূল সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্য এখানে ব্যক্ত হয়েছে। যেমন, ইতিহাস তথা সমাজ, প্রকৃতি ও মহাকাল। লেখক স্বয়ং জানিয়েছিলেন, "এই পল্লীগ্রামের যে জীবনযাত্রা, শতাব্দীর পর শতাব্দী এই রকম, এই বাঁশ শিমুল বনে অপরাজেয় শোভা এমনি ধারা দেখা যায়—ঝিঙে ক্ষেতে এমনি ফুল ফোটে—কত বনসিতলার ঘাট, কত গ্রাম্য মেয়ে, কত হাসিকান্না বিরহ—এই রকম চলবে। এদের নিয়ে একটা উপন্যাস লিখবো .....মহাকাল যেন এই উপন্যাসের পটভূমি।" (বিভূতি রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড, 'উৎকর্ণ', পৃঃ—৪৪৯)। 'ইছামতী'তে কালহীন প্রকৃতির সৌন্দর্যের মধ্যে, ধীরবর্তনশীল পল্লীজীবনযাত্রার মধ্যে চিরকালের সম্পদকে উপহার দিয়েছেন লেখক—যার নাম মহাকাল। তাই এই উপন্যাসে অনেক কাহিনি, অনেক চরিত্র এসেছে আবার তারা হারিয়ে গেছে যে যার নিজেদের মতো, কিন্তু মহাকালের সংবাদ তারা বহন করে নিয়ে গেছে। এই চিরন্তনত্বের জন্যই 'ইছামতী' একটি মহাকাব্যিক উপন্যাস।

□ ছোটগল্প ঃ

বিভূতিভূষণের ছোটগল্পে রয়েছে পল্লীগ্রামের গার্হস্থ্য জীবনের ছবি। সেই ছবি আমাদের অতি পরিচিত ও বাস্তব। এই বাস্তবতা মানবধর্মে ও প্রাকৃতিক রূপে। শুধু প্রকৃতি সংলগ্নতায় নয়, বিভূতিভূষণের ছোটগল্পের চরিত্রগুলি অনেক বেশি প্রাকৃতিক (Natural) এবং তাই তা স্বাভাবিক। আসলে এই স্বাভাবিকতা এসেছে লেখকের অখণ্ড জীবনবোধের জন্যই। যে জগৎ তিনি এঁকেছেন ছোটগল্পে, তা তাঁর চোখে দেখা একান্ত নিজস্ব উপলব্ধির জগৎ। তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের তাই পার্থক্য বর্তমান।

'দিনলিপি'তে তিনি নিজেই জানিয়েছেন, "জগতে অসংখ্য আনন্দের ভাণ্ডার উন্মুক্ত আছে। গাছপালা, ফুল, পাখি, উদার মাঠঘাট, সময়, নক্ষত্র, সন্ধ্যা, জ্যোৎস্নারাত্রি, অস্ত সূর্যের আলোয় রাঙা নদীতীর, আলোকময়ী উদার শূন্য—এসব থেকে এমন বিপুল অব্যক্ত আনন্দ অনন্তের উদার মহিমা প্রাণে আসতে পারে—সহস্র বৎসর ধরে তুচ্ছ জাগতিক বস্তু নিয়ে মত্ত থাকলেও সে বিরাট অসীম, শান্ত উল্লাসের অস্তিত্ব সম্বন্ধেই কোন জ্ঞান পৌঁছায় না। জগতের শতকরা নিরানব্বই জন লোক এ আনন্দের অস্তিত্ব সম্বন্ধে মৃত্যুদিন পর্যন্ত অনভিজ্ঞই থেকে যায়—শতবর্ষজীবী হলেও পায় না। সাহিত্যকারের কাজ হচ্ছে এই আনন্দের বার্তা সর্বসাধারণের প্রাণে পৌঁছে দেওয়া।" (স্মৃতির রেখা, ভাগলপুর, ৩০শে এপ্রিল, ১৯২৫)

বিভূতিভূষণের প্রকাশিত গল্পের সংখ্যা ২২৪ ('বিভূতিভূষণের গল্পসমগ্র', প্রথম খণ্ড, ১৯৭৫, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯৭৮)। তাঁর গল্পগ্রন্থের সংখ্যা চব্বিশ ঃ ১. মেঘমল্লার (১৯৩১),

ডাকটি তুচ্ছ হলেও এর মধ্যে নিহিত রয়েছে শ্রেণী ও ধর্ম নির্বিশেষে মহামিলনের সুর। বিশেষ করে এক গ্রাম্য সাধারণ নারীর অসাধারণ মাতৃত্বকে রূপ দিয়েছেন গল্পকার। আনন্দের পথিক বিভূতিভূষণের পক্ষেই এমন তুচ্ছ ঘটনার মধ্যে সত্যস্বরূপ আনন্দকে উপলব্ধি করা সম্ভব।

জীবনধারা ভিত্তিক গল্পে বিভূতিভূষণ জীবনের গভীর তলদেশে ডুব দিয়ে জীবনের মহার্ঘ রত্ন আবিষ্কার করে দেখিয়েছেন আমাদের। এই জগৎ ছিল আমাদের কাছেও অচেনা। অধ্যাপক জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এ বিষয়ে লিখেছেন, "জীবনধারা ভিত্তিক গল্পে কাহিনীর স্পর্শমাত্র নেই। অথচ এগুলি চিত্রজাতীয় রচনা নয়, দিনলিপি বা ভ্রমণ বৃত্তান্তের ছেঁড়া পাতাও নয়। এদের একটা সুনির্দিষ্ট শিল্পরূপ আছে—আদি আছে, মধ্য আছে, অন্ত আছে, রসপরিণতিও সুপরিকল্পিত। এসব গল্পের রস সর্বপ্রকার বিশ্লেষণের অতীত।" (ভূমিকা, বিভূতিভূষণ গল্পসমগ্র, প্রথম খণ্ড)

এ ধরনের গল্প হল 'দিববসান'। এই গল্পে আছে এক বিশেষ অনুভূতি। এই বিপুল পৃথিবীর অমেয় শক্তিধারা, বিপুল বিশ্বের জীবনাবেগ, যা গল্পকথকের স্বগতচিন্তায় ব্যক্ত হয়েছে। শীতের অপরাহ্ন বেলায় নোনা গাছের তলায় শুয়ে গল্পকথক অনুভব করে বনজ উদ্ভিদের প্রাচুর্য, সবুজের সমারোহ, শান্তি ও নির্জনতা। আবার নোনাগাছের তলা থেকে উঠে এসে আর এক জীবনানুভবের কথা শোনান—"এই পাখী, এই প্রজাপতিটা, এই ফুল, এই তুচ্ছ কি গাছটা, এই লতা, এই আকাশ, বাতাস, জল, মাটি, ঐ যে উজ্জ্বল হয়ে আসছে ঐ চাঁদটা, এই চারিধার এই প্রাণীজগতে ঐ লক্ষ মাইল দূরের সূর্য, ঐ অনন্ত মহাব্যোম, এই বিপুল বিশাল অচিন্তনীয় অসীমতা, সবগুলোর মধ্যে পরস্পরে কি আশ্চর্য নাড়ীর যোগ, কি বিপুল রহস্যে ভরা তাদের এই পরস্পর নির্ভরতা।" জীবনের প্রবল নিঃশব্দ উচ্ছ্বাসের শান্ত স্বীকৃতিই এ গল্প।

বিভূতিভূষণের ছোটগল্পের সামগ্রিক মূল্যায়ন প্রসঙ্গে অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় যথার্থই বলেছেন, "বিভূতিভূষণের শিল্পসার্থক গল্পগুলির উৎসভূমি আধ্যাত্মিক উপলব্ধি, গভীর প্রকৃতিবোধ ও প্রবল মানবপ্রীতি, মানুষ ও নিসর্গ, মানুষের প্রাত্যহিক জীবন। কর্মব্যস্ত অগভীর একঘেয়ে জীবনের অন্তরালে লুকানো সৌম্য আনন্দময় আধ্যাত্মিক জীবন, প্রবল নিঃশব্দ উচ্ছ্বাসময় জীবন-মন্দাকিনীর শান্ত প্রবাহ বিভূতিভূষণের ছোটগল্পের মূল উপাদান। বিভূতিভূষণ কেবল মাটি ও মানুষের শিল্পী নন, আকাশভরা আনন্দলোক ও ঐশী মহিমারও রূপকার।" (কালের পুত্তলিকা—১৯৮২, প্রথম সংস্করণ, পৃঃ—৩০৫)

॥ দুই ॥

আরণ্যক ঃ উৎস ও প্রকাশ

'আরণ্যক' গ্রন্থাকারে প্রকাশের আগে 'প্রবাসী' পত্রিকার কার্তিক (১৩৩৪ বঙ্গাব্দ) সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয় এবং শেষ হয় ১৩৪৫ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন সংখ্যায়। গ্রন্থ হিসেবে প্রকাশিত হয় ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে।

ভারতের সাহিত্য অকাদেমি 'আরণ্যক'-কে বাংলা ভাষায় লেখা দশখানা শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের

মধ্যে স্থান দিয়েছে এবং ভারতের প্রত্যেকটি আঞ্চলিক ভাষায় এই গ্রন্থের অনুবাদ ও প্রচারের ব্যবস্থা করেছে।

তাঁর অপ্রকাশিত দিনলিপি-তে ১৯৩৪-এ লিখেছেন–"A novel on forests"। ওতে নির্জনতার কথা থাকবে, গাছপালার কথা থাকবে, ... Forest এর নভেলে জমিদার অর্থবান ও Rich, প্রজা দুঃস্থ ও গরীব। উভয়ের দ্বন্দ্ব, এইটি ফোটাব—ওরা হোমলেস। ওরা খেতে পায় না।"

আরণ্যকের জগৎ যে লেখকের মানস কল্পনার ফসল নয় সেই আশঙ্কা নিরসনের উদ্দেশ্যে বিভূতিভূষণ নিজেই বলেছেন যে, " 'আরণ্যকে'র পটভূমি সম্পূর্ণ কাল্পনিক নয়। কুশী নদীর অপর পারে এরূপ দিগন্ত-বিস্তীর্ণ অরণ্য-প্রান্তর পূর্বে ছিল, এখনও আছে।" ভাগলপুর জেলার জঙ্গল, আজমাবাদ, লবটুলিয়া, ইসমাইলপুর, মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেস্টের প্রান্তসীমা—এই বিরাট অঞ্চলে ব্যাপ্ত যে অরণ্য এবং পাহাড়ী অঞ্চল–'আরণ্যকে' সেই অরণ্যাঞ্চলেরই রূপ বর্ণনা এবং সেখানকার অরণ্যবাসীদের জীবন পরিচয় লিপিবদ্ধ হয়েছে।

'স্মৃতির রেখা' নামে তাঁর যে ডায়েরি প্রকাশিত হয়েছে, সেখানে তাঁর ভাগলপুরের কর্মজীবনের কিছু কথা আছে। এবং তখনকার তাঁর যে সব মনোভাবের পরিচয় তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন–তার সঙ্গে 'আরণ্যকে'র বহু অংশের মিল দেখা যায়।

'স্মৃতির রেখা' ডায়েরি-গ্রন্থে দেখি– "এই জঙ্গলের জীবন নিয়ে একটা কিছু লিখবো– একটা কঠিন শৌর্যপূর্ণ, গতিশীল, ব্রাত্য জীবনের ছবি। এই বন, নির্জনতা, ঘোড়ায় চড়া, পথ হারানো অন্ধকার—এই নির্জনে জঙ্গলের মধ্যে খুপরি বেঁধে থাকা। মাঝে মাঝে, যেমন আজ গভীর বনের নির্জনতা ভেদ ক'রে যে শুঁড়ি পথটা ভিটে-টোলার বাথানের দিকে চলে গিয়েচে দেখা গেল, ঐ রকম শুঁড়িপথ এক বাথান থেকে আর এক বাথানে যাচ্চে– পথ হারানো, রাত্রের অন্ধকারে জঙ্গলের মধ্যে ঘোড়া ক'রে ঘোরা, এদেশের লোকের দারিদ্র্য, সরলতা, এই verile, active life, এই সন্ধ্যায় অন্ধকারে ভরা গভীর বন ঝাউবনের ছবি এই সব। (১২.২.১৯২৮)

'স্মৃতির রেখা' গ্রন্থের কিছু বর্ণনা পড়লে তো মনে হয় যেন 'আরণ্যক' উপন্যাসের অংশ পড়ছি। "বৈকালে ঘোড়া চড়ে বেড়াতে গিয়ে দেখলাম ভীমদাস টোলার নীচেকার আলটায় অত্যন্ত জল বেড়েছে–ঘোড়ার এক বুক জল হলো পার হবার সময়। ওপারের বটেশ্বরের পাহাড়টা কি অপূর্ব নীল রং দেখাচ্চে। ডান দিকে লাল রঙের অস্ত-আকাশ—উন্মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে একা। সীমাহীন প্রান্তর, ফুলে ভরা সবুজ কাশবন, অস্ত-আকাশে রক্ত মেঘ, নীল পাহাড়, ঢালু দূর্বা ঘাসের মাঠ, ধুতুরা ফুলের ঝোপ, বড় পাকুড় গাছতলায় হলুদ রাঙা জরদা রং-এর সন্ধ্যামণি ফুলের বন, এদিকে ওদিকে পাখী ডাকছে, ক্ষেতে গরু চরছে—বাঁধের নীচে জলের ধারে বকের দল বসে আছে, স্নিগ্ধ খোলা মাঠের সান্ধ্য বায়ু—মনটা যেন এই অপূর্ব সীমাহীনতার মধ্যে দূর প্রসারী শ্যামল প্রান্তরের মধ্যে ছড়িয়ে ছড়িয়ে গেল। (৪.৯.১৯২৭)

অরণ্য চিরকাল তাঁকে টেনেছে। তাঁর দিনলিপিতে দেখি চাঁইবাসার কাছে সারান্তা অরণ্যে গভীর রাত্রে ভাবছেন–

"মহাকাল এখানে অচঞ্চল, স্তব্ধ মৌন বনস্পতিশ্রেণীর মত ধ্যানসমাহিত। এই

আকাশ, এই নির্জন জ্যোৎস্না, এই নিশীথ রাত্রি, এই গভীর অরণ্য যেন কি কথা বলচে নিঃশব্দতার সুরে সুরে মিলিয়ে অন্তরাত্মার কানে তার সুগোপন বাণীটি পৌঁছে দিচ্ছে। সে বাণী নৈঃশব্দের বটে, কিন্তু অমরতার বার্তা বহন করে আনচে। এই অরণ্যই ভারতের আসল রূপ, সভ্যতার জন্ম হয়েচে এই অরণ্যশক্তির মধ্যে, বেদ উপনিষদ জন্ম নিয়েচে এখানে—এই সমাহিত স্তব্ধতায়—নগরীর কল-কোলাহলের মধ্যে নয়। আজ এখানে এসে মনে হচ্ছে, অশোকের সময়েও এই কোইনা নদী ঠিক এমনি বয়ে চলতো এই গভীর অরণ্যের মধ্যে দিয়ে—এই অরণ্য আরো গভীরতর ছিল....।"

(হে অরণ্য কথা কও, পৃঃ ৩০, দিনের পর দিন)

একমাত্র বিভূতিভূষণই অরণ্যানীর মৌন আত্মা আবিষ্কার করেছেন বাংলা সাহিত্যে ঃ মহাকালের মন্দধ্বনি কান পাতলে শোনা যায় সেই বিপুল গম্ভীর পরিবেশে। এক আস্তিক্যময় মানবপ্রত্যয় তাঁর বিশ্বজগৎ, সমস্ত চেতনা-চিন্তন-বিশ্বাস ব্যেপে রয়েছে। তাঁর ধ্যানে মহাকালের ভয়াল উপলব্ধি, তবু একটি দুঃখী মেয়ের আরণ্যমুখ দেখে, একটি অচরিতার্থ কবি-যশঃপ্রার্থীর বেদনায়, একটা সদাহাস্যময় নর্তক বালকের অপমৃত্যুতে তাঁর আত্মা হাহাকার করে ওঠে। বিশ্বের তুচ্ছতম ঘটনাটি কোন এক অনির্দেশ্য আইনে উল্কার গতি আর নীহারিকাপুঞ্জের–দাবদাহের সঙ্গে জড়িত। বিশ্বসৃষ্টিতে বিশ্লিষ্টতা অপ্রাসঙ্গিকতার স্থান স্বল্প। বিভূতিভূষণের কল্পজগতে ইতিহাসবোধ প্রবল। কোন ইতিহাস? "আমি শুধু কৌতূহলাক্রান্ত এই মহাকাব্যের মিছিলে। এই অপূর্ব গতিভঙ্গী। মহাকালের এই তাণ্ডব নৃত্যছন্দ যুগ যুগ ধরে রাজা মহারাজা সাম্রাজ্য—এ কাহিনীকে উড়িয়ে ফেলে দিয়ে আপন মনে কোন বিশাল অন্তরের মৃদঙ্গের—গভীর বোলের সঙ্গে তাল রেখে চলেছে—দিকে দিকে, যুগে যুগে, ইউট্রোপিয়াস, গিলডো রুফাইলাসের দল ও তাদের কড়ির পুঁটলি ফেনার ফুলের মত মিলিয়ে যাচ্ছে – জাতি, মহাদেশ মথিত হয়ে যাচ্ছে তাঁর বিরাট চরণপোষণে, মহাশূন্যে তাঁর মহাবিষাণ শুধু অনন্তকাল ধরে এই চলে যাওয়ার উদাস ভেরীধ্বনি বাজাচ্ছে।" (স্মৃতির রেখা, পৃঃ ৩৭, দিনের পর দিন)

'স্মৃতির রেখা'য় দেখা যায়—

"পুরা যত্র স্রোতঃপুলিনমধুনা তত্র সরিতাম্। প্রাচীন যুগের অধুনাতন লুপ্ত যে মহাসমুদ্র প্রাচীন পৃথিবীর পৃষ্ঠে হাজার হাজার লুপ্ত জন্তু বুকে করে প্রবাহিত হ'ত সেই প্রাচীন মহাসমুদ্রের তীরে যেন এরা চুপ করে বসে থাকতো। তাদের মাথার উপরকারের নীল আকাশে অহরহ পরিবর্তনশীল মেঘস্তূপের চঞ্চল এই বিশ্ব তার প্রাচীন আদিম যুগের লতাপাতা জীবজন্তুসহ তাদের চারধারে এমনি করেই মায়াপুরী রচনা করে রইত। এমনি প্রভাতে সূর্যের আলো প্রাচীন যুগের সাগর-বেলায় পড়তো। ... সবসুদ্ধ নিয়ে প্রাচীন মহাসমুদ্রের বেলাভূমি আজকাল অন্ধকার খনি-গর্ভে চুনা পাথরে রূপান্তরিত হয়ে আছে।"

'আরণ্যক' উপন্যাসেও এই ধরনের ভাবনা দেখা যায়—"অতীত কোন দিনে, এই যেখানে বসিয়া আছি, এখানে ছিল মহাসমুদ্র—প্রাচীন সেই মহাসমুদ্রের ঢেউ আসিয়া আছাড় খাইয়া পড়িত ক্যাম্বিয়ান যুগের এই বালুময় তীরে—এখন যাহা বিরাট পর্বতে পরিণত হইয়াছে। এই ঘন অরণ্যানীর মধ্যে বসিয়া অতীত যুগের সেই নীল সমুদ্রের স্বপ্ন দেখিতাম।"

"এই বালু প্রান্তরের শৈলচূড়ায় সেই বিস্মৃত অতীতের মহাসমুদ্র বিক্ষুব্ধ উর্মিমালার চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে—অতি স্পষ্ট সে চিহ্ন—ভূতত্ত্ববিদ্‌দের চোখে ধরা পড়ে। মানুষ তখন ছিল না, এ ধরনের গাছপালাও ছিল না, যে ধরনের গাছপালা জীবজন্তু ছিল, পাথরের বুকে তারা তাদের ছাঁচ রাখিয়া গিয়াছে, যে কোনো মিউজিয়মে গেলে দেখা যায়।"

১৯২৪ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারির শেষ দিকে পাথুরিয়াঘাটা ঘোষ-পরিবারের গৃহশিক্ষক বিভূতিভূষণ, খেলাতচন্দ্র ঘোষ এস্টেটের ভাগলপুর জঙ্গলমহালের অ্যাসিস্টান্ট ম্যানেজার হয়ে চার বছর কাটিয়ে এসেছিলেন ইসমাইলপুর ও আজমাবাদের আরণ্য পরিবেশে এবং দিনের পর দিন ভ্রমণ করেছেন ভাগলপুর ও পূর্ণিয়া জেলার জঙ্গালাকীর্ণ অঞ্চলে। 'স্মৃতির রেখা'-তে জানিয়েছেন, "আরণ্যক গ্রন্থের গোষ্ঠবাবু মুহুরি, রামচন্দ্র আমিন, আসরফি টিন্ডেল, জয়পাল কুমার, পণ্ডিত মটুকনাথ, রাখাল ডাক্তারের স্ত্রী, কবি বেঙ্কটেশ্বর প্রসাদ—এই সমস্ত চরিত্রই সেখানে স্বনামে উপস্থিত। এই গ্রন্থের কিছু ঘটনা সেখানে লেখা আছে ডায়েরিতে নোট নেবার মতো করে, যেমন—"কাল বৈকালে পরশুরামপুরে লবটুলিয়ার এপারে খুব দাঙ্গা হয়ে গেল। দাঙ্গার হৈহৈ শব্দ কাছারি থেকে শোনা যাচ্ছিল। নারায়ণকে ঘোড়া দিয়ে পাঠান হল।"

বিভূতিভূষণের মতে, 'আরণ্যক' কল্পিত কোনো সামগ্রী নয়, লেখকের নিজের অভিজ্ঞতারই কথা এবং সেই অভিজ্ঞতাকে তিনি গল্পের ছলে বর্ণনা করেছেন, যা পাঠকের কাছেও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। 'কলিকাতা শহরের হৈ-চৈ কর্মকোলাহলের' বাইরে 'লবটুলিয়া বইহার কি আজমাবাদের সে অরণ্যভূভাগ, সে জ্যোৎস্না, সে তিমিরময়ী স্তব্ধ রাত্রি ..... এক সৌন্দর্যভরা জগতের স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম, পৃথিবীতে তেমন দেশ যেন কোথাও নাই। শুধু বনপ্রান্তর নয়, কত ধরনের মানুষ দেখিয়াছিলাম।" তাই মানুষ ও প্রকৃতির ঐকতানকে উপলব্ধি করার তাগিদ থেকেই 'আরণ্যক'-এর সৃষ্টি। সভ্য সমাজ থেকে দূরে প্রকৃতিকে দেখার এবং প্রকৃতিসংলগ্ন মানুষের হৃদয়বৃত্তিকে উপলব্ধি করার মানসিকতা থেকেই লেখকের 'আরণ্যক' রচনার প্রয়াস।

॥ তিন ॥

কাহিনীবিন্যাস ও গঠনকৌশল ঃ আঙ্গিকের অভিনবত্ব

'আরণ্যক'-এর কাহিনীবিন্যাস ও গঠনকৌশল অভিনব এবং অন্যান্য উপন্যাসের কাহিনীবিন্যাসের সঙ্গে এর পার্থক্যও যথেষ্ট। কেননা এই উপন্যাসে আদ্যন্ত দৃঢ় ও নিটোল কোনো কাহিনী নেই, নেই কাহিনী নির্ভরতা। তবে লেখক এই উপন্যাসে বস্তুজগতের বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলি পরপর এমনভাবে সাজিয়েছেন– যাতে প্রকৃতি ও সেই প্রকৃতি সংলগ্ন নরনারী একটি সামঞ্জস্যের সূত্রে গ্রথিত হয়েছে। ঔপন্যাসিক এককভাবে কোনো মানুষের জীবনবৃত্ত রচনা করতে চাননি। সকলের কিছু কিছু পরিচয় দিয়ে লেখক এই জঙ্গালের শান্ত, সরল, দরিদ্র, শ্রমজীবী মানুষদের সম্পর্কে একটা সাধারণ ধারণাই ফুটিয়ে তুলতে চান। তাই এই উপন্যাসের আঙ্গিক অভিনব।

প্লটের বিচারে আরণ্যকের প্লটের প্রকৃতি যৌগিক। কারণ এই উপন্যাসে একটি মূল

কাহিনীর সঙ্গে একাধিক শাখাকাহিনী নেই বরং বিভিন্ন চরিত্র আশ্রয় করে খণ্ড খণ্ড কাহিনীর সমন্বয়ে গঠিত একটি প্লট রয়েছে। লেখকের উদ্দেশ্য ছিল সত্যচরণের উপলব্ধি বর্ণনার সূত্রে তার প্রকৃতিমুগ্ধতা ও অরণ্যসংলগ্ন মানুষের জীবন-জীবিকাকে উপস্থাপন করা। সাধারণত আমরা উপন্যাসে একটি সুগঠিত প্লট, কতকগুলি চরিত্র এবং সংলাপের মধ্য দিয়ে এবং ঔপন্যাসিকের বর্ণনার মধ্য দিয়ে কাহিনীটিকে অগ্রসর হতে দেখি এবং সমগ্র উপন্যাসের মধ্যে লেখকের একটি দর্শন বা উদ্দেশ্য প্রত্যাশা করি—যা 'আরণ্যক' উপন্যাসে নেই।

ঔপন্যাসিক স্বীয় কল্পনাবলে ঘটনাকে এমনভাবে বিন্যস্ত করেন যা পাঠকের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। আরণ্যকে যেহেতু একটি জীবনকেন্দ্রিক কাহিনীর বিস্তার নেই, তাই এখানকার কাহিনীর মধ্যে কৌতূহলরস সৃষ্টি হয়নি। আরণ্যকের বিষয়বস্তুর বিন্যাস বিশ্লেষণ করলে কাহিনীর দুটি বিভাগ লক্ষ্য করা যায়। প্রথম থেকে নবম পরিচ্ছেদ পর্যন্ত একটি খণ্ড এবং দশম থেকে অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত দ্বিতীয় খণ্ড। প্রথম আটটি পরিচ্ছেদে লেখক ব্যবহার করেছেন নাগরিক মানুষ সত্যচরণের আরণ্যপ্রীতি-র রূপ উপস্থাপন করার জন্য এবং নবম পরিচ্ছেদ থেকে অরণ্যসংলগ্ন মানুষের রূপকে দেখাতে সচেষ্ট হয়েছেন।

আরণ্যকের শুরুতে একটি প্রস্তাবনা অংশ সংযোজিত হয়েছে—যার মধ্যে লেখক আরণ্য ও অরণ্য সংলগ্ন প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁর মুগ্ধতার কথা জানিয়েছেন, "ইহাদের কথাই বলিব। জগতের যে পথে সভ্য মানুষের চলাচল কম, কত অদ্ভুত জীবনধারার স্রোত আপনমনে উপলবিকীর্ণ অজানা নদীখাত দিয়া ঝিরঝির করিয়া বহিয়া চলে সে পথে, তাহাদের সহিত পরিচয়ের স্মৃতি আজও ভুলিতে পারি নাই।"

সেইসঙ্গে প্রস্তাবনা অংশে আরণ্যকের কাহিনী বর্ণনার কারণ সম্পর্কে লেখক জানিয়েছেন, "এই স্বচ্ছন্দ প্রকৃতির লীলাভূমি আমার হাতেই বিনষ্ট হইয়াছিল, বনের দেবতারা সেজন্য আমায় কখনও ক্ষমা করিবেন না জানি। নিজের অপরাধের কথা নিজের মুখে বলিলে অপরাধের ভার শুনিয়াছি লঘু হইয়া যায়। তাই এই কাহিনীর অবতারণা।"

প্রথম পরিচ্ছেদে চারটি বিভাগ–যেখানে সত্যচরণের বেকারত্ব, বন্ধুর সঙ্গে আলাপ ও চাকরি প্রাপ্তি। কাছারিতে গোষ্ঠবাবুর সঙ্গে আলাপ, কাছারিতে মুনেশ্বর সিং-এর লোহার গড়া কিনে দেবার আবদার এবং সত্যচরণের তা মঞ্জুর ও এই প্রসঙ্গে সত্যচরণের উপলব্ধি বর্ণিত হয়েছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে পাঁচটি বিভাগ। প্রথমেই কলকাতা থেকে সদ্য আগত সত্যচরণের অরণ্য সম্পর্কে উপলব্ধি ও মানসিক দ্বন্দ্বের রূপ চিত্রিত হয়েছে। তারপর যথাক্রমে এসেছে স্পাইডার লিলির সৌন্দর্য, বিনা নিমন্ত্রণে আসা গনোরী তেওয়ারীর মুগ্ধতা, সত্যচরণের প্রকৃতি-মুগ্ধতা ও গণু মাহাতোর প্রসঙ্গ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদে চারটি বিভাগ। প্রথমেই এসেছে নন্দলাল ওঝার কথা, যেখানে সত্যচরণ নন্দলালের সুবিধাবাদকে প্রশ্রয় দেয়নি। সেইসঙ্গে এসেছে অরণ্যের রুক্ষ রূপ, নীল গাই ও হায়েনার কথা, দাবানলের দৃশ্য।

চতুর্থ পরিচ্ছেদে রয়েছে তিনটি বিভাগ। কাছারিতে পুণ্যাহ উৎসব, জাতিভেদ,

গাঙ্গোতাদের পরিচয় দিয়ে পরিচ্ছেদের শুরু। ধাওতাল, রাসবিহারী সিং-এর মহাজনি কারবার ও তাদের বৈপরীত্য, জয়পালের পরিচয়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদেও চারটি বিভাগ। দেবী সিং রাজপুতের পরিচয়, নির্মমতার শিকার কুন্তা, নাটুয়া ধাতুরিয়া, লবটুলিয়ার পাটোয়ারীর ভাই ব্রহ্মা মাহাতো, বাসন্তী পূর্ণিমার জ্যোৎস্না রাতে আলোর মালা প্রভৃতির বর্ণনা।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে চারটি বিভাগ। প্রকৃতির সৌন্দর্য, মানুষ ও প্রকৃতির ঐকতান, অতিপ্রাকৃত প্রসঙ্গ (জীনপরী), রাজু পাঁড়ের স্বরূপ, জঙ্গালের কুটিরে কুটিরে দারিদ্র্যের মূর্তি, মহালিখারূপের জঙ্গালে ও পাহাড়ে রহস্যময় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এই পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত হয়েছে।

সপ্তম পরিচ্ছেদে কোনো বিভাগ নেই। পরিচ্ছেদের শুরু 'দেশের জন্য মন কেমন করা একটি অতি চমৎকার অনুভূতি' দিয়ে। সরস্বতী কুণ্ডী ও তৎসংলগ্ন পরিবেশের সৌন্দর্য, রাসবিহারী সিং-এর কাছ থেকে সত্যচরণের পাওয়া হোলির নিমন্ত্রণ ও নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়ে রাসবিহারী সিং সম্বন্ধে তার জিজ্ঞাসা, 'এ বর্বর প্রাচুর্য তবে কোন কাজে লাগে? নিরীহ গাঙ্গোতা প্রজা ঠেঙাইয়া এ প্রাচুর্য অর্জন করার ফলে কাহার কি সুবিধা হইতেছে?" সেইসঙ্গে ছক্করবাজি নাচ দেখানো ধাতুরিয়ার কথা।

অষ্টম পরিচ্ছেদে তিনটি বিভাগ। প্রথমেই রয়েছে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রতি মুগ্ধতা এবং 'দেশকে কী ভাল করিয়া চিনিলাম বিদেশে গিয়া'– এই অতীতচারী অনুভূতি। অরণ্যসংলগ্ন কুশী নদীর তীরের সৌন্দর্য, সীতাপুর গ্রামের রাখালবাবুর মৃত্যুর পর তার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের বিদেশে নিঃস্ব ও অসহায় অবস্থা, সরস্বতী কুণ্ডীর নৈসর্গিক সৌন্দর্য, যুগলপ্রসাদের প্রকৃতি-প্রীতি উপস্থাপিত হয়েছে।

নবম পরিচ্ছেদে পাঁচটি বিভাগ এবং সত্যচরণের জঙ্গালে আসার তিন বছর পরের ঘটনা স্থান পেয়েছে। শহর থেকে আসা সত্যচরণের যে পরিবর্তন এখানে হয়েছে তার প্রমাণ দিতে গিয়ে বলেছে, "লবটুলিয়া ও আজমাবাদের বন্য প্রকৃতি কি মায়া-কাজল লাগাইয়া দিয়াছে আমার চোখে – শহরকে একরকম ভুলিয়া গিয়াছি।" এছাড়া রয়েছে মটুকনাথ পাঁড়ে-র কল্যাণ চিন্তা, নাঢ়া বইহারের উর্বর জমিতে সর্ষে চাষ ও 'লাঠি যার ফসল তার' এই নীতির কথা সত্যচরণের জ্ঞাত হওয়া, ফুলকিয়া জঙ্গালে কাটুনি মজুরের অবস্থান, গনোরী তেওয়ারীর প্রসঙ্গ প্রভৃতি।

দশম পরিচ্ছেদের দুটি অংশ। অরণ্যসংলগ্ন মানুষের জীবন-জীবিকার প্রতি সত্যচরণের গভীর আসক্তি, গাঙ্গোতা নকছেদী ভকতের প্রসঙ্গ এবং মঞ্চীর প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে।

একাদশ পরিচ্ছেদে দুটি অংশ। মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেস্টের দক্ষিণে কেঁদ, পলাশ ও শালের জঙ্গাল, দোবরু পান্না বীরবর্দির কাহিনী, ভানুমতীর আতিথেয়তা, দোবরু পান্নার পূর্বপুরুষদের দুর্গ-প্রাসাদ-এর স্বরূপ চিত্রিত হয়েছে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদে তিনটি পর্ব। প্রথমেই কাছারিতে বুনো শুওরের দলের চীনা ফসলের ক্ষেতে উপদ্রব, তারপর রাজু পাঁড়ের প্রসঙ্গ, বেজকটেশ্বর প্রসাদের প্রসঙ্গ ও তার কবিত্বশক্তি বর্ণিত হয়েছে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে তিনটি পর্ব। প্রায় তিনমাস পরে সত্যচরণের মহালে ফেরার

ঘটনা, মঞ্চীর প্রসঙ্গ, ঝুলন উৎসবে দোবরু পান্নার বাড়িতে সত্যচরণের আমন্ত্রণ গ্রহণ ও ভানুমতীর আতিথেয়তায় মুগ্ধ হওয়ার ঘটনা। সত্যচরণ আরণ্য পরিবারের সঙ্গে একান্ত হয়ে ওঠার দিকটিও প্রকাশিত হয়েছে।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদে চারটি পর্ব। প্রথমেই জঙ্গালের মধ্যে এক নাগরিক পরিবারের চড়ুইভাতির ঘটনা বিবৃত হয়েছে। সেই পিকনিক করতে আসা মানুষজনদের দেখে সত্যচরণের মন্তব্য, "প্রকৃতির এই অত্যাশ্চর্য সৌন্দর্যময় রাজ্যে দৈবাৎ যদি আসিয়াই পড়িয়াছেন, দেখিবার চোখ নাই আদৌ।" এর বিপরীতে দেখানো হয়েছে নগরের মোহে অরণ্য থেকে মঞ্চীর পলায়ন। এরপর নাঢ়া বইহারের অরণ্য প্রকৃতিকে দেখে মনে হয়েছে, 'এত ভালবাসি ইহাকে অথচ আমার হাতেই ইহা বিনষ্ট হইল।' তারপর দোবরু পান্নার মৃত্যু দেখানো হয়েছে।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে পাঁচটি পর্ব। প্রথম পর্বে মহাজন ধাওতাল সাহুর মহত্ত্বের দিকটি উপস্থাপিত হয়েছে। পরে এসেছে রাখাল ডাক্তারের স্ত্রীর মানবিক পরিচয়, বর্ষাকালে মোহনপুরা ফরেস্ট, কুশী নদীর স্বরূপ, ধাতুরিয়াকে সত্যচরণের নতুন করে জানা, লবটুলিয়ার পরিবর্তিত রূপ এবং রাজু পাঁড়ের দার্শনিক মন প্রভৃতির বর্ণনা।

ষোড়শ পরিচ্ছেদে পাঁচটি বিভাগ। যুগলপ্রসাদকে নিয়ে সত্যচরণের মহালিখারূপের পাহাড়ে চীহড় ফলের গাছের সন্ধান। সত্যচরণের গনোরীকে দিয়ে জঙ্গালমহালে শিক্ষার ব্যবস্থা করার ইচ্ছা পোষণ, গাঙ্গোতাদের জীবিকার সন্ধানে যাযাবর জীবন, কুন্তার অবস্থা বুঝে সত্যচরণের তাকে বিনা সেলামিতে দশ বিঘা জমি প্রদান-এর ঘটনা বিবৃত হয়েছে।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদে দুটি পর্ব। লবটুলিয়ার বস্তিগুলির সৌন্দর্য, ছট পরবের উৎসবের বর্ণনা, গিরিধারীলালের প্রসঙ্গ প্রভৃতি।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে তিনটি পর্ব। এই তিনটি পর্বে সত্যচরণের বিদায় গ্রহণ ও লেখকের জীবনদৃষ্টির স্বচ্ছ প্রকাশ। ভানুমতীকে দেখে সত্যচরণের উপলব্ধি, "ওকে দেখিলেই অলিখিত ভারতবর্ষের ইতিহাসের এই ট্রাজিক অধ্যায় আমার চোখের সামনে ফুটিয়া উঠে।" ভানুমতীর সত্যচরণকে নিয়ে ঝরনার কাছে বেড়ানো এবং সত্যচরণের ইচ্ছা, "এখানেই যদি থাকিতে পারিতাম! ভানুমতীকে বিবাহ করিতাম।" এই পরিচ্ছেদের শেষ পর্বে রয়েছে অরণ্য থেকে চলে গিয়ে অরণ্যের ভাল লাগা সম্পর্কে সত্যচরণের স্মৃতিচারণা।

সমস্ত বিষয়টিকে বিভূতিভূষণ এমনভাবে গল্পের মধ্য দিয়ে পরিবেশন করেছেন যে তা বিচ্ছিন্ন ঘটনা ও বিচ্ছিন্ন চরিত্র সমষ্টির কথা হলেও বিচ্ছিন্নতার যোগসূত্রটি বলার ভঙ্গিতে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। এজন্যই সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, "উপন্যাসটির পরিকল্পনার অভিনবত্ব বিস্ময়কর – ইহা সাধারণ উপন্যাস হইতে সম্পূর্ণ নূতন প্রকৃতির।" এর কারণ এককভাবে কোনো মানুষের জীবনবৃত্ত লেখক রচনা করতে চাননি। সকলের অল্প অল্প পরিচয় দিয়ে তিনি এই জঙ্গালের শান্ত সরল, দরিদ্র, পরিশ্রমী মানুষদের সম্পর্কে একটি ব্যাপক ও সাধারণ ধারণাই ফুটিয়ে তুলতে চান।

কোনো বিষয় বা কোনো চরিত্র সম্পর্কে এই উপন্যাসে কোনো ধারাবাহিক বর্ণনা

নেই, আবার এই উপন্যাস লোক সমাজের পারিবারিক গল্পও নয়, এমনকি সম্পূর্ণ প্রকৃতি বর্ণনাও নয়। লেখক যখন কোনো চরিত্রকে এনেছেন তখন সেই সূত্রে এসেছে প্রকৃতির কথা। তাই প্রকৃতি ও মানুষের মিশ্রণই আরণ্যকের উপকরণ। তাই গল্পের নির্দিষ্ট কাঠামো না থাকা সত্ত্বেও উপন্যাসের রসাস্বাদ বাধাপ্রাপ্ত হয় না।

আবার এই উপন্যাসে কাহিনীরস থাকলেও তার পূর্ণতা নেই। চলচ্চিত্র বা নাটকে যেমন পরপর দৃশ্যের অভিনয় হয় তেমনি এই উপন্যাসেও একটি ধারাবাহিক বর্ণনা আছে। তবে একই ছবির বা একই নাটকের কুশীলবের মতো এরা নয়; এদের ভিন্ন সুর, ভিন্ন কথা। তাই একটি আস্ত গোটা কাহিনী যা সাধারণ উপন্যাসে থাকে, তার একান্তই অভাব এই উপন্যাসে। তবুও ছোটগল্পের ঘটনার খানিক দ্যুতির মতো, আরণ্যকের অনেক ঘটনাই–তেমনি ঔজ্জ্বল্যময় ও স্বয়ংসম্পূর্ণ। তাই 'আরণ্যক' কাহিনীসর্বস্ব উপন্যাস নয় বরং তা লেখকের কবিমনের স্বচ্ছন্দ প্রকাশে এক নতুন আঙ্গিকের উপন্যাস। একদিকে প্রকৃতিকে নায়িকা সাজিয়ে তার সৌন্দর্যকে অবলোকন করা অন্যদিকে প্রকৃতি আশ্রিত নরনারীর হৃদয়বৃত্তিকে উদ্ঘাটিত করা–এই টেকনিক অবশ্যই অভিনব।

॥ চার ॥

আরণ্যক ঃ গোত্রবিচার

'আরণ্যক'-এর গোত্রবিচার প্রসঙ্গে বিভিন্ন সমালোচক এই গ্রন্থকে ডায়েরি বা দিনলিপি, ভ্রমণকাহিনী, উপন্যাস–এইসব অভিধায় অভিহিত করেছেন। এক্ষেত্রে গ্রন্থের সূচনায় লেখক স্পষ্টই জানিয়েছেন, "মানুষের বসতির পাশে কোথাও নিবিড় অরণ্য নাই। অরণ্য আছে দূর দেশে, যেখানে পতিত পক্ব জম্বুফলের গন্ধে গোদাবরী-তীরের বাতাস ভারাক্রান্ত হইয়া উঠে, 'আরণ্যক সেই কল্পনালোকের বিবরণ'। ইহা ভ্রমণবৃত্তান্ত বা ডায়েরি নহে–উপন্যাস। অভিধানে লেখে 'উপন্যাস' মানে বানানো গল্প।" মনে রাখতে হবে, আরণ্যকের কাহিনী সম্পূর্ণ কাল্পনিক নয়।

'আরণ্যক'-এ ডায়েরির উপাদান কতটা এবং একে ডায়েরি বা দিনলিপি জাতীয় রচনা বলা যায় কিনা আলোচনা করা যেতে পারে। ডায়েরি বা দিনলিপি হল ব্যক্তিগত রচনা। প্রত্যেক দিনের ঘটনা ডায়েরিতে লিপিবদ্ধ থাকলেও সেইসব ঘটনার মধ্যে যোগসূত্র খুবই কম। সেদিক থেকে 'আরণ্যক' ডায়েরি নয়। অবশ্য বিভূতিভূষণের ডায়েরি 'স্মৃতির রেখা'-র সঙ্গে আরণ্যকের অনেক ঘটনার মিল খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন, 'আরণ্যক' গ্রন্থে পুণ্যাহ উৎসবের দিনে বৃষ্টির জলে ভিজে কিছু মানুষের নিমন্ত্রণ খেতে আসার যে বিবরণ রয়েছে তা 'স্মৃতির রেখা'-তে পাওয়া যায়। এছাড়া বাপের বাড়ির লোককে দেখে মেয়েদের কান্নার রীতির কথা কিম্বা গিরিধারীলালের কথা ডায়েরি ও আরণ্যকে রয়েছে।

এইসব ঘটনা ও বিষয়ের কথা আরণ্যকে স্থান পেলেও বেশির ভাগ ঘটনা ও চরিত্রের কথা ডায়েরিতে নেই, যা আছে আরণ্যকে, এই নিরিখে আরণ্যককে ডায়েরিভুক্ত করা যায় না। কারণ ঃ

(এক) ডায়েরির মতো ব্যক্তিগত ঘটনা ক্রমবিন্যস্ত রূপে আরণ্যকে নেই। বরং বাস্তব ঘটনা এই গ্রন্থে কল্পনার ভিয়েনে গল্পরসে জারিত হয়ে পরিবেশিত হয়েছে।

(দুই) ডায়েরিতে যেমন বাস্তব নিজের রূপেই উপস্থিত থাকে 'আরণ্য'কে তেমনভাবে বাস্তব উপস্থাপিত হয়নি, বরং প্রত্যক্ষ কাহিনীতে কল্পনার রঙ ও গীতিকাব্যের মেজাজ ও সুর মিশ্রিত করা হয়েছে, যা হয়ে উঠেছে অধিকতর সত্য (Higher truth)।

(তিন) ডায়েরির মধ্যে ঘটনাসূত্রের অভাব, রসনিবিড়তার অভাব থাকে, কিন্তু আরণ্যকে তার অভাব নেই। কারণ এই গ্রন্থে একটি ঘটনাসূত্র নির্দিষ্ট রসপরিণতির দিকে ক্রম অগ্রসর হয়ে তা রসনিষ্পত্তি ঘটাতে সহায়ক হয়েছে – যা একান্তভাবে উপন্যাস শিল্পের অন্যতম গুণ।

(চার) আরণ্যক গ্রন্থের প্রথমের বর্ণনা পড়ে একথা পাঠকের মনে আসতেই পারে যে, লেখক বুঝি সত্যচরণের ব-কলমে দিনলিপির কথা বলতে চান। কিন্তু যে মুহূর্তে সত্যচরণ কলকাতার নগরজীবনের কথা ভুলে গিয়ে অরণ্যপ্রকৃতি ও প্রকৃতিসংলগ্ন মানুষের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেলেন তখনই তা দিনলিপির পরিধি উত্তীর্ণ হয়ে উপন্যাসের বৃত্তে পরিক্রমা করল।

(পাঁচ) ডায়েরিতে প্রতিদিনের কাজকর্মের বা উপলব্ধির রূপ লিপিবদ্ধ থাকে, যেখানে কল্পনার অবকাশ নেই বললেই চলে। আরণ্যকে রয়েছে অবাধ কল্পনার বিস্তার, ব্যক্তিক অনুভূতির সুরেলা প্রকাশ – যা অনায়াসেই পাঠকের হৃদয় ছুঁয়ে যায় – যা উপন্যাসের গোত্রভুক্ত।

(ছয়) ডায়েরিতে কোনো বানানো গল্প থাকে না, থাকে না ধারাবাহিকতা, বরং থাকে বিভিন্ন প্রসঙ্গের অবতারণা যার পটভূমি ও পরিবেশ ভিন্ন ভিন্ন। আবার দিনলিপিতে থাকে তারিখের নিরিখে বিভিন্ন ঘটনার নির্দেশ। কিন্তু আরণ্যকে গল্প অনেকটাই বানানো, বানানো গল্পের মধ্যে বাস্তব ও কল্পনার মিশ্রণে তা ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত এবং সাল তারিখের নিরিখে এখানে ঘটনা বর্ণিত হয়নি।

(সাত) আসলে বিভূতিভূষণের দিনলিপি যা 'স্মৃতির রেখা'-য় প্রকাশিত হয়েছে, তাতে দেখা যায়, " 'আরণ্যক' গ্রন্থের গোষ্ঠবাবু, মুহুরী, রামচন্দ্র আমীন, আসরফি টিণ্ডেল, জয়পাল কুমার, পণ্ডিত মটুকনাথ, রাখাল ডাক্তারের স্ত্রী, কবি বেল্কটেশ্বর প্রসাদ—এই সমস্ত চরিত্রই সেখানে স্বনামে উপস্থিত।" এই সূত্রে বলা যায়, 'স্মৃতির রেখা'-য় যখন বিভূতিভূষণ আরণ্য জীবনের নোট নিচ্ছিলেন তখন তিনি আরণ্যক রচনা করেননি। আরণ্য জীবনের কাহিনী যখন দিনলিপিতে স্থান পাচ্ছে তখন তিনি লিখছেন 'পথের পাঁচালী' ও 'অপরাজিত'। অরণ্য ত্যাগের দশ বছর পর যেহেতু 'আরণ্যক' লেখা হয়েছে তাই তাৎক্ষণিক ঘটনা গ্রন্থে স্থান পায়নি। দিনলিপি যেহেতু তাৎক্ষণিক ঘটনার সমষ্টি তাই আরণ্যক এদিক থেকে দিনলিপি নয়।

সুতরাং আরণ্যক দিনলিপি বা ডায়েরি নয়। এই গ্রন্থে নির্দিষ্ট চরিত্রমালা এক বিরাট আরণ্য প্রকৃতির প্রতিবেশে আবর্তিত হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে সূক্ষ্ম সংহতি। তাই দিনলিপির লক্ষণ থাকা সত্ত্বেও আরণ্যক দিনলিপি নয়, তা উপন্যাস।

'আরণ্যক'-এ যেহেতু ভ্রমণের বৃত্তান্ত রয়েছে, তাই একে কেউ কেউ ভ্রমণ কাহিনী হিসেবে চিহ্নিত করতে চান। বিষয়টি বিচার করা যেতে পারে।

(ক) ভ্রমণ কাহিনীতে ভ্রমণ স্থানে যাত্রার বিবরণ থেকে শুরু করে যে স্থানে বা যে সব জায়গায় লেখক ঘুরে বেড়িয়েছেন তার বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনা ভ্রমণ কাহিনীতে দিয়ে থাকেন। সেখানে খুঁটিনাটি তথ্য প্রাধান্য পায়। কল্পনার স্থান ভ্রমণ কাহিনীতে থাকে না। তবে স্থানের মাহাত্ম্য বর্ণনা করে লেখক পাঠককে আকর্ষণ করার চেষ্টা করেন। বিভূতিভূষণ আরণ্যক-এর শুরুতে প্রস্তাবনা অংশে ভ্রমণবৃত্তান্ত বর্ণনার কায়দায় শুরু করেছেন, যেমন শুরু করেছেন শরৎচন্দ্র তাঁর 'শ্রীকান্ত' (১ম পর্ব) উপন্যাসে আত্মজীবনীর কায়দায়। আরণ্যকে পাই, "কলিকাতা শহরের হৈ-চৈ কর্মকোলাহলের মধ্যে অহরহ ডুবিয়া থাকিয়া এখন যখন লবটুলিয়া কি আজমাবাদের সে অরণ্য-ভূভাগ, সে জ্যোৎস্না, সে তিমিরময়ী স্তব্ধ রাত্রি, ধূ-ধূ বন ঝাউ আর কাশবনের চর, দিগ্বলয়হীন ধূসর শৈলশ্রেণী, গভীর রাত্রে বন্য নীল গাইয়ের দলের দ্রুত পদধ্বনি, খররৌদ্র মধ্যাহ্নে সরস্বতী কুণ্ডীর জলের পিপাসার্ত বন্য মহিষ, সে অপূর্ব মুক্ত শিলাস্তৃত প্রান্তরে রঙীন বনফুলের শোভা, ফুটন্ত রক্ত পলাশের ঘন অরণ্যের কথা ভাবি, তখন মনে হয় বুঝি কোন অবসর দিনের শেষে সন্ধ্যায় ঘুমের ঘোরে এক সৌন্দর্যভরা জগতের স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম, পৃথিবীতে তেমন দেশ যেন কোথাও নাই।"

ভ্রমণ কাহিনীর মতো উত্তম পুরুষের মাধ্যমটি এখানে কাহিনী বিবৃতির কাজে ব্যবহৃত হয়েছে। এমনকি ভ্রমণের ফলে লেখকের যে অভিজ্ঞতা তাও উপন্যাসে স্থান পেয়েছে। তবুও 'আরণ্যক' ভ্রমণ কাহিনী নয়। কারণ প্রকৃতিকে নায়িকা করে প্রকৃতির ঐশী সত্তাকে যেভাবে রূপায়িত করা হয়েছে তা ভ্রমণ কাহিনীতে থাকে না।

(খ) লেখক ভ্রমণকারীর মতো অরণ্যের নানা অঞ্চলে ঘুরে তাঁর মুগ্ধতার কথা গ্রন্থে রূপ দিয়েছেন। এমনকি অরণ্যসংলগ্ন নানা মানুষের সঙ্গে মিশে তাদের স্বরূপ চিত্রিত করেছেন, অঞ্চলগুলির ভৌগোলিক পরিচয়ও দিয়েছেন। আজমাবাদ, লবটুলিয়া ও নাঢ়া বইহার ভূগোলের দিক থেকে সত্য। কিন্তু আরণ্যক ভ্রমণ কাহিনী নয়। কারণ যে অভিজ্ঞতা লেখকের ছিল তা-ই শুধুমাত্র গ্রন্থে স্থান পায়নি, সেইসঙ্গে লেখকের সুন্দর বিস্তৃত কল্পনাও রূপায়িত হয়েছে।

(গ) ভ্রমণ কাহিনীতে যে মানুষজনের কথা আসে তারা পূর্ণ চরিত্রের নয়, তা ক্ষণকালের উদ্ভাসন মাত্র। কিন্তু আরণ্যকে চরিত্রগুলি তাদের পূর্ণ সত্তা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। এখানে অরণ্যপ্রকৃতি, মানুষ ও জন্তু এই প্রেক্ষিতে রূপায়িত, এই রূপায়ণের মধ্যে কোথাও খণ্ডতা বা অপূর্ণতা নেই।

(ঘ) আরণ্যক লেখকের চাকরি জীবনের এক অধ্যায়ের স্মৃতির রোমন্থন বিশেষ। সে কারণে পাঠকের মনে হওয়া স্বাভাবিক যে লেখক বুঝি উপন্যাসের ছদ্মবেশে নিজের ভ্রমণের স্মৃতি ব্যক্ত করতে চেয়েছেন। কিন্তু লেখক সেই স্মৃতিকে শিল্পরূপ দিয়ে এক মরমী ও মধুর আলেখ্য রচনা করেছেন—যা ভ্রমণ কাহিনীর মাধ্যমে সম্ভব নয়। এমনকি আরণ্যকে চরিত্র, ঘটনা এবং জীবনের যে সুর রয়েছে, তা ভ্রমণ কাহিনীতে থাকে না।

এবারে 'আরণ্যক'-কে উপন্যাস বলা যায় কিনা সে আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যেতে পারে।

(অ) আরণ্যকের ভূমিকায় লেখক একে 'উপন্যাস' নামেই অভিহিত করেছেন। আসলে চিরাচরিত রীতির উপন্যাস নয় বলেই অনেকের কাছে তা সংশয় সৃষ্টি

করেছে। তাছাড়া এই উপন্যাসের বিষয় ও পরিকল্পনা অভিনব। মানুষ ও প্রকৃতি এখানে একাকার। এই একত্বের রূপ আঁকতে গিয়ে লেখক প্রকৃতির মধ্যে ঐশী সত্তাকে রূপায়িত করেছেন–যা উপন্যাসের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ।

(আ) আরণ্যকে একটা পূর্বাপর যোগসূত্র সম্বলিত কাহিনীর রূপায়ণ নেই বলেই একে কেউ কেউ উপন্যাস বলতে চান না। কিন্তু নিটোল কাহিনীর অভাব পূর্ণ করে দিয়েছে প্রকৃতি ও প্রকৃতিসংলগ্ন মানুষের বাস্তব ও স্বাভাবিক বর্ণনা – যা পাঠকের কৌতূহলকে শেষপর্যন্ত জাগিয়ে রাখে।

(ই) যেহেতু 'আরণ্যক' কাহিনী নির্ভর নয়, তাই লেখক এই উপন্যাসে চরিত্রচিত্রণে গতানুগতিক কৌশল ত্যাগ করেছেন। আসলে অরণ্যের অসংখ্য গাছপালার মতো প্রচুর চরিত্র নিজের নিজের স্বাতন্ত্র্য নিয়ে সত্যচরণের দৃষ্টিতে ঘোরাফেরা করেছে। বিভিন্ন শ্রেণীর চরিত্র থাকলেও একই শ্রেণীচরিত্রের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন স্বাতন্ত্র্য ও বৈপরীত্য লক্ষ করবার মতো—যা উপন্যাসেই সম্ভব।

(ঈ) উপন্যাসে ঔপন্যাসিকের একটি নির্দিষ্ট জীবনদর্শন থাকে। আরণ্যক উপন্যাসেও বিভূতিভূষণের জীবনদর্শনের পরিচয় পাই। তাই তো প্রকৃতির মধ্যে কিছুটা আধ্যাত্মিক উপলব্ধি ও অনির্বচনীয় মিস্টিক বোধ উপন্যাসে প্রত্যক্ষ করি। প্রকৃতির অপরিমেয় রহস্য উন্মোচনে লেখকের বিশিষ্ট জীবনদর্শন তথা প্রকৃতি দৃষ্টি উপন্যাসে লগ্ন হয়ে রয়েছে। প্রকৃতির বিরাটত্বের সঙ্গে ক্ষুদ্র মানুষের জীবনধারনের সরল, সহজ ও স্বাভাবিক রূপ যেভাবে চিত্রিত হয়েছে তাতে বিভূতিভূষণের ঔপন্যাসিক সত্তার স্বরূপটি উদ্ঘাটিত হয়েছে। প্রকৃতি, মানুষ ও ঈশ্বর বিশ্বাস – এক বিন্দুতে মিলিত হয়েছে।

(উ) যে বাস্তবতা ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ সত্য উপন্যাসের অন্যতম শর্ত তারও অভাব নেই আরণ্যকে। আরণ্যকে বর্ণিত ঘটনার মধ্যে কল্পনা থাকলেও তা সম্ভাব্য সত্য, মিথ্যা নয়। বস্তুজগতের ছবিই লেখকের কল্পনায় জারিত হয়ে উপন্যাসে উপস্থাপিত হয়েছে। সর্বোপরি অরণ্যানী ও পাত্রপাত্রীর অবিকল চেহারাগুলিকে লেখক বাস্তব পরিবেশে চিত্রিত করেছেন। অরণ্যের মাধুর্য, মায়াময়তা, রহস্য যেমন আছে তেমনি অরণ্য স্বভাবের যুগলপ্রসাদ, গনৌরী তেওয়ারী, কুন্তা, ভানুমতীও আছে। এগুলির বাস্তবতা নিয়ে কোনো পাঠক সন্দেহ করে না।

উপসংহারে বলা যেতে পারে, আরণ্যক দিনলিপি বা ভ্রমণ কাহিনী নয়, তা উপন্যাস, তবে তা নতুন রীতির উপন্যাস, কেউ বলেছেন 'লিরিক্যাল উপন্যাস' (রবীন্দ্র কুমার দাশগুপ্ত)। অরণ্যের কথা ও মানুষের কথা যেহেতু এক হয়ে গিয়েছে, তাই তা নতুন ধরনের উপন্যাস। সত্যচরণের ভূমিকা এখানে উত্তম পুরুষের এবং উপন্যাসের শেষে সত্যচরণের বিষাদও তাই পাঠককে স্পর্শ করে। গতানুগতিকতা অতিক্রম করে লেখক ভাবের অখণ্ডতা ও ঔপন্যাসিক বিস্তৃতি ও ব্যাপকতা দিয়ে, মোহময়ী ভাষায় যে বাস্তব রূপ গ্রন্থে চিত্রিত করেছেন, তাতে আরণ্যক হয়ে উঠেছে এক অভিনব উপন্যাস।

আরণ্যকের সাদৃশ্য থাকতেই পারে এবং থাকাটা দোষেরও নয়। কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গির যে অখণ্ডতা তা বিভূতিভূষণের নিজস্ব। তাই প্রকাশভঙ্গির স্বরূপও পৃথক। সেজন্য 'আরণ্যক' বিভূতিভূষণের মৌলিক সৃষ্টি।

॥ সাত ॥

আরণ্যকের নামকরণ ঃ অরণ্যের গান

'আরণ্যক' প্রকৃতি ও মানুষের ঐকতান এবং আরণ্যকের স্রষ্টা অরণ্যপ্রেমিক ও মানবপ্রেমিক। বিভূতিভূষণ 'আরণ্যক'-এ দেখিয়েছেন প্রকৃতিকে যারা ভালবাসে প্রকৃতি তাদের রক্ষা করে। অরণ্য প্রকৃতির বাহ্যিক ও আন্তরিক রূপ আবিষ্কারের কাহিনী বলেই এই উপন্যাসের নামকরণ সার্থক। 'আরণ্যক' কথাটার অভিধানগত একাধিক অর্থ আছে। 'আরণ্যক' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল—সং অরণ্য+ক। 'অরণ্য' শব্দের ওপর 'তত্রভব'—এই অর্থে অক (বুঞ্) তদ্ধিত প্রত্যয় যুক্ত হয়ে 'আরণ্যক' শব্দটি গঠিত হয়েছে, গঠিত শব্দের অর্থ হলো 'বনস্থিত' বা 'বন্য'। তবে 'আরণ্যক' শব্দের দ্বারা অরণ্যভব মানুষ, মুনি প্রভৃতিকেও বোঝানো হয়ে থাকে। এসব প্রত্যয়গত অর্থের সঙ্গে আমাদের আলোচ্য 'আরণ্যকে'র কোনো সংস্রব নেই।

'তত্রভব' এই প্রত্যয়গত অর্থ দিয়ে বিচার করলেও দেখা যাবে—অরণ্যে জাত যে আদিম মানুষজন, যে সব পশুপাখি—তারা অরণ্যের বৃক্ষরাজি ও লতাগুল্মের মতো একান্ত অপরিহার্যভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। এই উপন্যাসে অর্ধেক অরণ্য, বাকি অর্ধেক মানুষজন ও পশুপাখি। আবার মানুষজনের মধ্যে অরণ্যজাত মানুষ (তত্রভব অর্থে) আছে, আর অরণ্যে আগত অর্থাৎ উপজাত মানুষ যেমন—মুসম্মত কুন্তা, মঞ্চী, নকছেদী, নন্দলাল বা রাসবিহারী সিং রাজপুত—এরাও অরণ্য পরিবেশের অপরিহার্য অংশ হয়ে আরণ্যক হিসাবে গণ্য হয়েছে। 'আরণ্যক' উপন্যাস এদেরকে নিয়েই সর্বাঙ্গসুন্দর।

অরণ্য প্রকৃতিকে নিয়ে লেখা এমন বিচিত্র স্বাদের উপন্যাসের এমন যথোপযুক্ত নাম যে খুবই মানানসই, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। অরণ্যপ্রকৃতি বলতে অবশ্য শুধু বনপ্রকৃতি নয়, বনের মানুষজন, বনের জন্তু জানোয়ার, পশুপাখি—সব কিছুকেই বোঝানো হয়েছে। শুধু প্রকৃতিই যদি লেখকের উদ্দিষ্ট বিষয় হতো, তবে 'আরণ্যক' নামটির তাৎপর্য অনেকখানি হারিয়ে যেত। অরণ্যের এক বিস্তৃত পটভূমির ওপর আরণ্য প্রাণীর, আরণ্য গাছপালার বিচিত্র রহস্যময়তা ও প্রকৃতির অন্তর্লীন সুর বর্ণনা করেছেন লেখক।

এমনকি অরণ্যকে কেন্দ্র করে এই উপন্যাস, আর সেই অরণ্য শুধু বন বনানীর সমাহার নয়, সেই বনের আদিম অধিবাসী, সেই বনের জন্তু জানোয়ার, সেই বনের প্রাকৃতিক শোভা সৌন্দর্য, সেই বনের রুক্ষতা-রোষ ও সেখানকার দাবানল, জিনপরী-ডামাবাণু, বুনো মহিষের দেবতা টাঁড়বারো—সব কিছুই লেখক অসীম মমতা ও তন্ময়তার সঙ্গে বর্ণনা করেছেন। এখানে লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাই ফলপ্রসূ হয়েছে। যে মহৎ অরণ্যানী তিনি পাথুরিয়াঘাটা এস্টেটের সহকারী ম্যানেজার হিসাবে ভাগলপুর ও পূর্ণিয়া জেলা অঞ্চলে ঘুরেছেন—সেই অঞ্চলকেই উপন্যাসে তুলে

ধরেছেন। উপন্যাস লিখেছেন বটে, কিন্তু তিনি কোনো ব্যক্তি মানুষের জীবনদ্বন্দ্বের অবতারণা করে, তার সমস্যাবলী আলোচনা করে সমাধান দেখাবার চেষ্টাও করেন নি। অরণ্যকে নিয়েই উপন্যাস, সেই অরণ্যের প্রকৃতিই নায়িকা, কোনো নায়কের কথা নেই, তাই 'আরণ্যক' গ্রন্থনামটি যথার্থ বলেই মনে হয়।

আবার অরণ্যপ্রকৃতিও এখানে শুধু বহিঃরূপ নিয়ে আবির্ভূত নয়। লেখক আরণ্য সৌন্দর্যের রূপমুগ্ধতার তন্ময়তাই শুধু বর্ণনা করেন নি, অরণ্য প্রকৃতির অভ্যন্তরীণ রহস্যময়তায়ও আবিষ্ট হয়েছেন। "সেদিন আমার সত্যই মনে হইয়াছিল এখানে (সরস্বতী কুণ্ডীর তীরে) মায়াবিনী বনদেবীরা গভীর রাত্রে জ্যোৎস্নাস্নাত হ্রদের জলে জলকেলি করিতে নামে। চারিধার নীরব, নিস্তব্ধ পূর্বতীরের ঘন বনে কেবল শৃগালের ডাক শোনা যাইতেছিল, দূরের শৈলমালা ও বনশীর্ষ অস্পষ্ট দেখাইতেছে—জ্যোৎস্নার হিম বাতাসে গাছপালা ও ভোমরা লতার নৈশ-পুষ্পের মৃদু সুবাস—আমার সামনে বন ও পাহাড়ে বেষ্টিত নিস্তরঙ্গ বিস্তীর্ণ হ্রদের বুকে হৈমন্তী পূর্ণিমার থৈ থৈ জ্যোৎস্না.....পরিপূর্ণ ছায়াহীন, জলের উপরে পড়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিমালায় প্রতিফলিত হওয়া অপার্থিব দেবলোকের জ্যোৎস্না.....ভোমরালতার সাদা ফুলে ছাওয়া বড় বড় বনস্পতি শীর্ষে জ্যোৎস্না পড়িয়া মনে হইতেছে গাছে গাছে পরীদের শুভ্র বস্ত্র উড়িতেছে.....।"

লেখক প্রকৃতিলক্ষ্মীর রূপতন্ময়তা ছাড়িয়েও প্রকৃতির মধ্যে চেতনা আবিষ্কার করেছেন। অরণ্য-প্রকৃতি এই উপন্যাসে প্রধান, অরণ্যই সর্বত্র নিয়ন্তা, অরণ্যের মানুষগুলির কোনো প্রভাব অরণ্যের ওপর নেই, তারাই অরণ্যের দ্বারা প্রভাবিত, অরণ্যই তাদের নিজের প্রয়োজনে নিজের ছাঁচে যেন গড়ে নিয়েছে মনে হয়, তাই 'আরণ্যক' নামটি দিয়ে লেখক অরণ্যের স্বাতন্ত্র্য স্বয়ংক্রিয় কর্মপদ্ধতি এবং সর্বব্যাপক নিয়ন্ত্রণের কথাই প্রচ্ছন্নভাবে বলতে চেয়েছেন।

অরণ্য প্রকৃতির মধ্যে বিভূতিভূষণ আধ্যাত্মিক চেতনা এবং ঐশী প্রেরণা দেখতে পেয়েছেন, 'আরণ্যক' উপন্যাসের অরণ্যশোভা বর্ণনা করতে করতে যখন তিনি তন্ময় হয়ে যাচ্ছেন, তখন তিনি প্রকৃতির মধ্যে কেমন যেন একটা রহস্যময় ভাবাবেশ লক্ষ করেছেন, এ ঠিক ঐশ্বরিক বা দিব্যানুভূতি নয়।

ঈশ্বর সম্পর্কে তাবৎ জ্ঞান ও উপলব্ধি বেদের যে ব্যাখ্যায় আছে তা হলো উপনিষদ আর তার 'ব্রাহ্মণ' এবং 'আরণ্যক' নামে আর দুটি ভাগ আছে। বেদের উপসংহার ভাগ হলো ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্মণের উপসংহার ভাগের নাম হলো আরণ্যক। যজ্ঞাদি কর্মানুষ্ঠানের জন্য যেমন ব্রাহ্মণ খণ্ডের প্রয়োজন, বাণপ্রস্থাশ্রমীর জন্যে তেমন আরণ্যকের প্রয়োজন। ব্রহ্মচর্য গ্রহণ করার পর অরণ্যাশ্রমে বাস করার সময় গুরুর কাছ থেকে যেসব উপদেশ ও শিক্ষালাভ হতো, আরণ্যকে তা লিপিবদ্ধ হয়। অরণ্যাশ্রমে এর উৎপত্তি বলেই এর নাম হয়েছে আরণ্যক।

'আরণ্যক' উপন্যাসের নাম তাই বৈদিক 'আরণ্যক' শব্দের সূত্রানুযায়ী বা ধারা অনুসরণ করে রাখা হয়েছে—বলা চলেই না, তবে অরণ্যের বিষয়, অরণ্যের ঘটনা, অরণ্যের জীবনযাত্রা—আরণ্যক সব কিছু নিয়েই এই উপন্যাসের বৃত্ত রচিত হয়েছে। তাই 'আরণ্যক' নামটি যথার্থ।

অরণ্যসম্ভূত বস্তু ও ব্যক্তি নিয়েই এই উপন্যাস। এই উপন্যাসের আদি অন্তে—সর্বত্রই শুধু অরণ্য, অরণ্যের প্রকৃতি, তার প্রভাব, তার প্রাণস্পন্দন, তার আধ্যাত্মিক দ্যুতি। অরণ্য প্রকৃতি ও প্রকৃতিজাত মানুষের ঐকতান হল আরণ্যক। তাই এই উপন্যাসের 'আরণ্যক' নামটি যথাযথ ও সার্থক হয়েছে—তা বলাই বাহুল্য।

॥ আট ॥

আরণ্যকের প্রকৃতি ও বিভূতিভূষণের নিসর্গ দৃষ্টি

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় মন্তব্য করেছিলেন, 'অরণ্যকে পটভূমি করে যে কোনো রকমের উপন্যাস হতে পারে, বাঙালী পাঠক এর আগে তা ভাবতে পারেনি। 'আরণ্যকে'র প্রকৃতি চিত্রণ ভিন্ন ধরনের, এই ধরনটা হল ব্যক্তি নিরপেক্ষ, বস্তুনিষ্ঠ বা objective পদ্ধতি। 'আরণ্যক' উপন্যাসের প্রকৃতিকেই প্রায় সব সমালোচক নায়ক বা নায়িকা বলে অভিহিত করেছেন এবং বিভূতিভূষণের প্রকৃতিমনস্কতা আবার অন্য যে কোনো কথাশিল্পীর থেকে স্বতন্ত্র। 'তৃণাঙ্কুর' গ্রন্থে লিখেছেন, 'এই প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সুখদুঃখের যোগ আছে বলেই এত ভাল লাগে।' লেখক তাই লবটুলিয়া বইহারের অরণ্যানীতে, বনপাহাড়ে মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেস্টে, সরস্বতী কুণ্ডীর ধারে প্রকৃতির রূপ চিত্র ফুটিয়েছেন।

'আরণ্যক' উপন্যাস বিভূতিভূষণের এক বিচিত্র এবং বিস্ময়কর সৃষ্টি। এই উপন্যাসে প্রকৃতির সূক্ষ্ম, কবিত্বপূর্ণ বর্ণনা আছে। শুধু বর্ণনা নয়—প্রকৃতির আধ্যাত্মিক স্বরূপও এখানে অতি সূক্ষ্মতার সঙ্গে বিশ্লেষিত হয়েছে।

এই উপন্যাসে প্রকৃতিই মুখ্য, মানুষ গৌণ। লেখক বাস্তব দৃষ্টি দিয়ে প্রকৃতিকে দেখেছেন, তেমনি দিব্যদৃষ্টি দিয়েও প্রকৃতিকে উপলব্ধি করেছেন; প্রকৃতির রূপ দেখে মুগ্ধ হয়েছেন, সেই রূপমুগ্ধতায় আবিষ্ট হয়েছেন। প্রকৃতির মধ্যে একটি ঐশী প্রেরণা লাভ করেছেন। সত্যচরণের ব-কলমেই পাঠককুল অরণ্যের সৌন্দর্য-রহস্য বন-প্রকৃতির রূপজ মোহে মুগ্ধ ও বিহ্বল হয়ে পড়ে। আবার 'এই প্রকৃতির একটা রহস্যময় অসীমতার, দুরধিগম্যতার, বিরাটত্বের ও ভয়াল গা-ছমছম করানো সৌন্দর্যের দিকটা'ও সত্যচরণকে আকৃষ্ট করে। অর্থাৎ প্রকৃতির কোমল ও ভয়ঙ্কর উভয় রূপকেই বিভূতিভূষণ আরণ্যকে উপস্থাপন করেছেন।

প্রথমেই দেখা যায় সত্যচরণ নির্জন অরণ্য-প্রকৃতির রূপ, মোহ এবং সৌন্দর্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ বিতৃষ্ণ; প্রকৃতি রহস্যে বীতরাগ সেই যুবক বনলক্ষ্মীর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন, প্রকৃতির রঙ-রূপ-রস তাঁকে আচ্ছন্ন করেছে, অরণ্যভূমির নির্জনতা ও নিস্তব্ধতা প্রথমের দিকে তাঁর ভালো লাগেনি; কিন্তু নিস্তব্ধ জনহীন নিশীথ রাত্রিতে অরণ্যে পরিপ্লাবিত জ্যোৎস্না দেখে বিহ্বল হয়ে বলেছেন যে, সে-রকম ছায়াবিহীন জ্যোৎস্না জীবনে দেখেননি।

বিভূতিভূষণ জন্ম-প্রকৃতিপ্রেমিক, তাই এই অরণ্যের প্রকৃতির রূপবৈচিত্র্য, বিশালতা, রহস্যতন্ময়তা তাঁর মনকে আধ্যাত্মিক এবং মিস্টিক বোধের আলোয় উদ্ভাসিত করে তুলেছে। সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতির মর্মাশ্রয়ী এক নিবিড় অখণ্ড চৈতন্যশক্তির অনুভবে তাঁর

হৃদয় শান্ত হয়েছে। এই নিবিড় অরণ্য প্রকৃতিকে তাঁর মনে হয়েছে যেন কোন্ এক মহান কবির আশ্চর্য শিল্প রচনা। পাঠকও যেন মনশ্চক্ষে প্রকৃতির এই সৌন্দর্য রহস্যে ও রূপমোহে তন্ময় হয়ে পড়ে।

'আরণ্যক' উপন্যাসে প্রকৃতি শুধুমাত্র পটভূমি নয়, মানুষেরও পরিপূরক, কোথাও বা আবার স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্তা। খণ্ড বিচ্ছিন্ন রূপাভিব্যক্তির মধ্যে দিয়ে, বনচর পশুপাখির আচরণে অরণ্যবাসী মানুষজনের জীবনচর্চায় প্রকৃতি স্বয়ং উপস্থিত হয়েছে। প্রকৃতিকে গড়তে হয়নি, প্রকৃতিই যেন মানুষকে নিজের করে গড়ে নিয়েছে, তাই মানুষেরা প্রকৃতিরই আর এক শরিক বলে মনে হয়েছে। এখানে প্রকৃতিই প্রধান।

ফুলকিয়া বইহারের প্রকৃতিকে দেখে লেখক মুগ্ধতার কথা প্রকাশ করতে গিয়ে বলেছেন—"কতরূপে কত সাজেই যে বন্যপ্রকৃতি আমাকে মুগ্ধ অনভ্যস্ত দৃষ্টির সম্মুখে আসিয়া আমায় ভুলাইল!—কত সন্ধ্যা আসিল অপূর্ব রক্তমেঘের মুকুট মাথায়, দুপুরের খরতর রৌদ্র আসিল উন্মাদিনী ভৈরবীর বেশে, গভীর নিশীথে জ্যোৎস্নাবরণী সুরসুন্দরীর সাজে হিমস্নিগ্ধ বনকুসুমের সুবাস মাখিয়া, আকাশভরা তারার মালা গলায়—অন্ধকার রজনীতে কালপুরুষের আগুনের খড়্গ হাতে দিগ্বিদিক ব্যাপিয়া বিরাট কালীমূর্তিতে।" এই প্রকৃতির মধ্যে রয়েছে স্বয়ংসম্পূর্ণ রসসত্তা, ইন্দ্রিয়-সচেতন লেখক সেই রূপকে চিত্রের মতো অঙ্কন করেছেন।

প্রকৃতির এই জগতে যে-সব পরিবর্তনশীলতা, যে-সব আবর্তন-বিবর্তন—সে সবের মধ্যেও এক সুগভীর অপরিমেয় রহস্যবোধ অবিচল কেন্দ্রবিন্দুর মতো স্থির হয়ে আছে। লেখকের সেই অনুভূতি হয়েছে। সেই রহস্যলোকের অস্পষ্ট একটা ধারণা তার মনে দানা বেঁধেছে, পূর্ণ রূপে তার উপলব্ধি ঘটেনি।

প্রকৃতির রূপলোকের আড়ালে বিভূতিভূষণ প্রকৃতির প্রাণচেতনাকে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করেছেন, আমরা যাকে ঐশী প্রেরণা বলে আগে ইঙ্গিত দিয়েছি। প্রকৃতির প্রাণশক্তিকে লেখক কখনো প্রশান্ত, কখনো বা ভয়াল সর্বনাশা বলে ভেবেছেন। "গভীর রাত্রে ঘরের বাহিরে একা আসিয়া দাঁড়াইয়া দেখিয়াছি, অন্ধকার প্রান্তরের অথবা ছায়াহীন ধূ-ধূ জ্যোৎস্নাভরা রাত্রির রূপ। তার সৌন্দর্যে পাগল হইতে হয়—একটুও বাড়াইয়া বলিতেছি না—আমার মনে হয় দুর্বলচিত্ত মানুষ যাহারা, তাহাদের পক্ষে সে-রূপ না দেখাই ভালো, সর্বনাশী রূপ সে, সকলের পক্ষে তার টাল সামলানো বড় কঠিন। তবে একথাও ঠিক প্রকৃতিকে সে রূপে দেখাও ভাগ্যের ব্যাপার।"

'উৎকর্ণ' গ্রন্থে বিভূতিভূষণ লিখেছেন—"এই আকাশ, রঙিন মেঘরাজি, সবুজ বাঁশবন—এদের সবটা জড়িয়ে যে বিরাট বিচিত্র বিশ্বপ্রকৃতি, তা হৃদয়হীন নয়। তা ভালবাসে, দয়া করে। দুঃখে সহানুভূতি দেখায়।" প্রকৃতির এই প্রাণচেতনার প্রতি বিভূতিভূষণের পূর্ণ বিশ্বাস ছিল। 'আরণ্যকে'র প্রকৃতি তাই তাঁর কাছে অচিরেই সজীব ও প্রাণময়ীরূপে দেখা দিয়েছে। এদিক থেকে জীবনানন্দ বিভূতিভূষণের সমগোত্রীয়।

বিভূতিভূষণ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যরূপ ছাড়িয়ে প্রকৃতির মধ্যে ইন্দ্রিয়াতীত যে সত্যের উপলব্ধি করেছেন—সেখানেই তাঁর প্রকৃতিচেতনার বৈশিষ্ট্য। তাই তিনি প্রকৃতির মধ্যে 'উচ্চাঙ্গের নীরব সঙ্গীত' শুনেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের নিবিড় সম্পর্ক আছে। প্রকৃতি মানুষের বন্ধু, মানুষকে প্রকৃতি ভালবাসে, মানুষের প্রতি তার স্নেহ, দয়ামায়া, ভালবাসার সীমা-পরিসীমা নেই। প্রকৃতির এইরকম সজীব সত্তায়

বিভূতিভূষণ বিশ্বাসী ছিলেন। তাই কি পল্লীর ঘরোয়া পটভূমিকে কি বিশাল অরণ্যের দিগন্তবিস্তৃত আবহে প্রকৃতির স্নিগ্ধতা ও বিস্ময় তাঁকে মুগ্ধ ও আচ্ছন্ন করে রাখতো। এই বিস্ময় ও মোহ—তাঁকে প্রকৃতির শান্ত রসের পূজারী করে তুলেছে। যেমন, "...বর্ষাসজল হাওয়ায় মেঘকজ্জল আকাশের নীচে এই মরকতশ্যাম তৃণভূমির মাথায় ঢেউ খেলিয়া যাইতেছে—আমি যেন একা এই অকূল সমুদ্রের নাবিক—কোন্ রহস্যময় স্বপ্নবন্দরের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিয়াছি।" প্রকৃতির মাধ্যমে লেখক রোমান্সের ধারাকে প্রত্যক্ষ করিয়েছেন।

বস্তুতন্ময়তায় আবিষ্ট হয়েও লেখকের রোমান্টিক প্রকৃতিদৃষ্টির পরিচয়ও 'আরণ্যকে' ফুটে উঠেছে। একদিকে যেমন প্রকৃতির রূপচ্ছটার আবহ-বর্ণনা, অন্যদিকে তেমনি সৌন্দর্যময় কল্পনার বিস্তার; বিভূতিভূষণ যেন এক রহস্যলোকের খোঁজ পেয়েছেন প্রকৃতির মধ্যে। আবার এই প্রকৃতি মানুষের সঙ্গে সম্পর্কিত, তা কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এজন্য আরণ্যক প্রকৃতি ও মানবের ঐকতান। সৌন্দর্যসাধক যুগলপ্রসাদকে জানতে গেলে প্রকৃতিকে জানতেই হয়।

'আরণ্যকে'র প্রকৃতি প্রিয়তার সঙ্গে 'পথের পাঁচালী'র প্রকৃতিপ্রীতির কিছুটা পার্থক্য আছে। 'পথের পাঁচালী'তে আদ্যন্তই প্রকৃতির কথা, আর সেই প্রকৃতি হচ্ছে লেখকের রোমান্টিক স্বপ্নাতুর চোখে দেখার ছবি; 'আরণ্যকে'র প্রকৃতি বর্ণনায় মিস্টিক ও রহস্যময় চেতনার সন্ধান পাওয়া যায়। লেখক এখানে মরমী ও মিস্টিক রূপ দিয়ে প্রকৃতির অন্তর্লীন সত্তাকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছেন। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপতন্ময়তা উভয় উপন্যাসেই অপূর্ব রোমান্টিক ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে কিন্তু 'আরণ্যকে'ই শুধু মরমীর তত্ত্বদৃষ্টিতে মিস্টিক হয়ে উঠেছে। তাই জ্যোৎস্নালোকিত স্তব্ধ নির্জন প্রান্তর দেখে তা পরীর রাজ্য মনে হয়েছে, ভয় ও সৌন্দর্যের যুগপৎ অনুভূতিতে উদাস অথচ মন-কেমন করার একটা পরিবেশ রচিত হয়েছে।

প্রকৃতির জগৎ স্বভাবজ, কারুর প্রতি সে নির্ভরশীল নয়, 'আরণ্যকে'র প্রকৃতিও স্বয়ংসিদ্ধ। 'পথের পাঁচালী'র গ্রামীণ প্রকৃতিও স্বাভাবিক। এখানের সোনা ডাঙ্গার মাঠ, কাঁচা মাটির পথ সুদূরের আভাস আনে। 'আরণ্যকে'র লবটুলিয়া বইহার, ফুলকিয়া বইহার, নাড়া বইহার, সরস্বতী কুণ্ডী, মহালিখারূপ পর্বতমালার দুর্গম অরণ্য অঞ্চল—অনন্তের আভাস আনে—'সকলের পক্ষে তার টাল সামলানো বড় কঠিন'।

॥ নয় ॥

আরণ্যক ঃ জাতিভেদভিত্তিক অন্ত্যজ জীবন

আরণ্যকে যে অরণ্যপ্রান্তর, দিয়ারা বা চারণভূমি রয়েছে একে কেন্দ্র করে নানান জাতির অন্ত্যজ বা প্রান্তিক জীবন-এর বাস্তব ছবি এঁকেছেন লেখক। এই সমাজ হল সীমান্ত সমাজ। জমিতে নতুন করে বাসস্থান হয়েছে, কুমারীভূমি কর্ষণ করে চাষের পত্তন হয়েছে, মেলা থেকে হাট, হাট থেকে বাজার এবং বস্তির উদ্ভব হয়েছে। এই সূত্রেই বিভিন্ন জাতির মানুষের আগমন এবং তাদের জীবন ও জীবিকার বিচিত্র রূপ এঁকেছেন বিভূতিভূষণ। কবিকঙ্কণও 'কালকেতুর নগরপত্তন' অংশে জাতিভেদভিত্তিক

নতুন সমাজ গঠনের বাস্তব রূপ চিত্রিত করেছেন—যা মধ্যযুগীয় জাতিভেদভিত্তিক সমাজ বিন্যাসের ধারাটিকে স্পষ্ট করে দিয়েছে।

সাঁওতালদের স্বরূপ, তাদের অতীত ও বর্তমানকে দোবরু পান্নার মাধ্যমে চিত্রিত করেছেন। সত্যচরণের জিজ্ঞাসার উত্তরে দোবরু পান্না বলেছে, "আমি যৌবন বয়সে কোম্পানীর সঙ্গে লড়েছি। এখন আমার বয়স অনেক। যুদ্ধে হেরে গেলাম। তারপর আর কিছু নেই।"

তাদের বংশে যে চাষবাস নেই, তারা যে শিকারে পটু—সে দিকটি প্রকাশিত হয়েছে দোবরু-র উক্তিতে, "শিকার করার মান সকলের চেয়ে বড়, তাও এক সময়ে ছিল বর্শা নিয়ে শিকার সবচেয়ে গৌরবের। তীর ধনুকের শিকার দেবতার কাজে লাগে না, ও বীরের কাজ নয়।"

লেখক এই জাতির ভবিষ্যৎ পরিণাম ও জীবিকা সম্বন্ধে উপলব্ধি করেছেন এভাবে, "রাজার মৃত্যুর পরই দেনাদার মহাজন রাজার গোরু মহিষ বেঁধে রেখেছে। গোরু-মহিষ যদি মহাজনে লইয়া যায়, তবে রাজপরিবারের অবস্থা খুবই হীন হইয়া পড়িবে—ঐ দুধের ঘি বিক্রয় করিয়া রাজার সংসারের অর্ধেক খরচ চলিত—এখন তাহাদের না খাইয়া মরিতে হইবে।"

জমিদারদের লোভের বাহন হিসেবে অরণ্যভূমিতে এসেছে গাঙ্গোতারা—যাদের হান্টার আধা-হিন্দু আদিবাসী বলে চিহ্নিত করেছেন, রিজলি-র বর্ণনায় এরা গরীব চাষী। চণ্ডীমঙ্গলে কালকেতুর নগর পত্তন কালে গুজরাটে বনকর্তনের জন্য যেমন বেরুনিয়াদের প্রয়োজন হয়েছিল, নাঢ়া বইহারের বন পরিষ্কার করে বসবাসের উপযোগী করার জন্যও প্রয়োজন হয়েছে গাঙ্গোতাদের।

গাঙ্গোতারা তৎকালীন সমাজে ছিল নীচ অস্পৃশ্য জাতি এবং এদের জীবিকা ছিল চাষবাস ও পশুপালন। এরা যাযাবরের মতো জীবনযাপন করে—আদিম সংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাসে এরা বিশ্বাসী। এরা সারাদিন ভূতের মতো খাটে, আর সন্ধ্যের সময় কলাই-এর ভূষির আগুন জ্বেলে সবাই গল্পগুজব করে, খৈনি খায় অথবা 'শাল-পাতার পিকার ধূমপান' করে।

অন্যদিকে ছট্টু সিংরা রাজপুত হলেও তাদের কাজ হল শক্তি দেখিয়ে জমি দখল করা, সুদের কারবার করা, জমিদার, দারোগা তহশীলদারকে ঘুষ ও ভেট দিয়ে লাঠিয়ালের দ্বারা জমির ফসল লুঠ করা।

আরণ্যকের সমাজ শ্রেণীবিভক্ত সমাজ—যেখানে স্থায়ী বসতির কোনো মানুষ নেই—সবাই অনুপ্রবেশকারী বা বাইরে থেকে আগত। এর মধ্যে যেমন গাঙ্গোতা কাটুনি মজুররা রয়েছে, তেমনি রয়েছে ছক্করবাজি নাচ-শেখা, নাচ-পাগল ছেলে ধাতুরিয়া। এছাড়া রয়েছে বিচিত্র ধরনের মানুষ—যারা সাধারণ সমাজের জীব নয়, টুলোপণ্ডিত মটুকনাথ, যার নেশা হল নতুন নতুন ফুলগুল্ম দিয়ে অরণ্যজননীর শোভা বর্ধন। এরা মূলত সমাজবিচ্ছিন্ন মানুষ—প্রান্তিক দুঃস্থ মানুষ। রয়েছে বিভিন্ন ব্রাত্য মানুষ যারা বিভিন্ন ভাবে শোষিত হয়েছে।

লেখক উপন্যাসে সমাজের নীচুতলার মেয়েদের জীবন-জীবিকার চিত্র এঁকেছেন। বাইজীর মেয়ে বলে পরিচিত মুসম্মত কুন্তা, এককালের দোর্দণ্ডপ্রতাপ রাজপুত দেবী

সিং-এর বিধবা পত্নী, যে কিনা সম্মান নিয়ে বাঁচার লড়াইয়ে সদা সচেষ্ট। আবার রাখালবাবুর স্ত্রী যিনি স্বামীর মৃত্যুর পর ছেলেমেয়ের মুখে খাবার তোলার তাগিদে দোসাদ গাঙ্গোতীনের মতোই রাতের অন্ধকারে ফসল কুড়োতে যায়। আর আছে ধ্রুবা ও তার বোনেরা যারা বাঙালী ভদ্র গৃহস্থের মেয়ে হয়েও বিহারের গ্রামে থেকে কৃষক রমণী হয়ে গেছে।

সত্যচরণ এদের দেখে বলেছেন, "হায় হতভাগিনী বাঙালী কুমারী। এত বৎসর পরেও সে নিশ্চয় আজও গাঙ্গোতীন সাজিয়া দাদার সংসারে যব কুটিতেছে, কলাইয়ের বোঝা মাথায় করিয়া মাঠ হইতে আনিতেছে, কে আর দরিদ্রা দেহাতী বিনাপণে বিবাহ করিয়া পাল্কীতে তুলিয়া ঘরে লইয়া গিয়াছে, মঙ্গলশঙ্খ ও উলুধ্বনির মধ্যে।"

মঞ্জীও অত্যাচারিত নারী, সে সত্যচরণের সঙ্গে সুখদুঃখের কথা বলে। তার ছেলে মারা যাওয়ার পর ঘর ছেড়ে চলে যায়। আরণ্যক-এর মানুষদের মধ্যে জাতপাত থাকলেও বিপদের দিনে জাতপাতের ঊর্ধ্বে উঠে মনুষ্যত্বের স্বরূপকে মেলে ধরতে দ্বিধা করে না। যেমন, রাজু পাঁড়ে শুয়োরমারির বস্তিতে ওলাউঠা হলে রোগিনীকে বাঁচিয়ে তোলে। গাঙ্গোতা গিরিধারীলাল দুষ্ট ক্ষত নিয়ে মৃতপ্রায় অবস্থায় সত্যচরণের কাছারিতে এলে রাজু পাঁড়ে তার চিকিৎসা করে, কুন্তা তাকে শুশ্রূষা করে বাঁচিয়ে তোলে। জাতের কথা উঠলে কুন্তা বলে, "আমি রাজপুত কোথায় বাবুজী। আমার জাতভাই কেউই এতদিন আমায় কি দেখেছে? আপনি যা বলবেন তাই করব। আমার আবার জাত কি।"

এই মানুষদের আহার চিনাঘাসের বীজ, ভাত তাদের কাছে বিলাসসামগ্রী, এরা যেন সভ্যতার উচ্ছিষ্ট। তাই রাজু পাঁড়ে প্রথমে ফসল ফলিয়ে জমিদারের খাজনা দিতে পারে না। সত্যচরণ শহর থেকে এসে বিহারের এই দরিদ্র অসহায় মানুষদের অসাধারণত্বের স্বাদ উপলব্ধি করেছে। তবে একথা ঠিকই, বিভূতিভূষণের শান্ত দৃষ্টির কারণে রাজপুত-গাঙ্গোতার দ্বন্দ্ব, জমিবিলির দুরন্ত বিপত্তি, কুন্তার নিগ্রহ, মঞ্জী-র পলায়ন, বাঙালী রাখালবাবুর পরিবারের সম্বলহীনতা ও অসহায় অবস্থা, বিহার প্রবাসী দরিদ্র বাঙালী ব্রাহ্মণ পরিবারের অবিবাহিতা মেয়ে ধ্রুবা ও জবার অরণ্যে কঠিন জীবনযাত্রা কোনোটাই ভীষণ রূপ পায়নি। অরণ্যে গড়ে ওঠা নতুন জীবনধারার মধ্যে জাতপাতের বৈচিত্র্য, জীবন-জীবিকার একমুখীনতা সত্ত্বেও এই প্রান্তিক মানুষগুলি বিভূতিভূষণের লেখনীতে সজীব হয়ে রয়েছে।

॥ দশ ॥

আরণ্যক ঃ অনার্য রাজার ইতিকথার যৌক্তিকতা

'আরণ্যক' উপন্যাস সত্যচরণের উপলব্ধির ইতিকথা হওয়ায় তাঁর দৃষ্টিপথে আসা প্রাচীন রাজবংশের কাহিনী উপন্যাসের মধ্যে বিশেষ স্থান করে নিয়েছে। শুধু তাই নয়, প্রাচীন এই রাজবংশের অতীত কাহিনী যেমন উপন্যাসের কাহিনীসূত্রকে বলিষ্ঠ করেছে, তেমনি ভানুমতীর প্রতি সত্যচরণের দুর্বলতাও উপন্যাসে বিশেষ আবহ সৃষ্টি করেছে।

যার পূর্বপুরুষেরা জঙ্গলমহালের আরণ্য ভূভাগ বহুদিন ধরে শাসন করেছিল সেই বংশের প্রতিনিধি দোবরু পান্নাকে সত্যচরণ প্রথম দেখলেন গরু চরানোর কাজে। কিন্তু সত্যচরণ তাঁর আতিথেয়তায় মুগ্ধ হয়েছেন, মুগ্ধ হয়েছেন তাঁর প্রপৌত্রী ভানুমতীর ব্যবহারে। সে কারণেই সত্যচরণের স্বীকারোক্তি, "এখানেই যদি থাকিতে পারিতাম! ভানুমতীকে বিবাহ করিতাম।" কারণ, ভানুমতী কালো হলেও নিটোল স্বাস্থ্যবতী, দয়া-মায়া-স্নেহ আছে। জঙ্গলমহালের শাসকের স্বরূপ ও ভানুমতীর প্রসঙ্গ উপন্যাসের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপেই চিত্রিত হয়েছে।

'আরণ্যক' উপন্যাসে উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক চরিত্র এই দোবরু পান্না। লেখক দেখিয়েছেন এক কালের আভিজাত্য থেকে মানুষ কীভাবে নিঃস্ব হয়ে যায়। তা না হলে ১৮৬২-র সাঁওতাল বিদ্রোহে নেতৃত্ব দানকারী দোবরু পান্না-কে চরম দারিদ্র্যে দিন কাটাতে হয়! বিরানব্বই বছরের বৃদ্ধকে গরু চরাতে হয়! শিকার ও গোচারণই এখন তার জীবিকা।

যৌবনে তিনি যে অতিশয় সুপুরুষ ছিলেন তার ছাপ এখনো তাঁর চেহারায় আছে। বৃদ্ধ রাজা দোবরু পান্না বলেন—তাঁরা সূর্যবংশীয়, এককালে এসব অঞ্চলেরই রাজা ছিলেন, কিন্তু কোম্পানীর সঙ্গে লড়ে হেরে যান।

রাজা দোবরু পান্না অতিথিপরায়ণ, তাঁর বংশে সকলেই অতিথির প্রতি সদাশয় ব্যবহার করেছেন। দোবরু নিজের বংশগৌরব সম্পর্কে খুব সচেতন। তাই অতিথির প্রতি কোনো ত্রুটি যাতে না হয়—সে-দিকে তাঁর যথেষ্ট নজর; সত্যচরণের আহার যাতে সুসম্পন্ন হয় সেজন্যে তিনি রান্না ঘরের দরজায় গিয়ে বসেছিলেন।

দোবরু পান্নার সৌজন্যবোধও খুব প্রখর। সত্যচরণের আহারের পর তিনি বললেন—আমার বেশি ঘরদোর নেই, আপনাদের বড় কষ্ট হলো। সত্যচরণ প্রাচীন রাজবাড়ির ভগ্নচিহ্ন এবং এই রাজবংশের ঠাকুর দেখতে চাইলেন, তখন বৃদ্ধ দোবরু সঙ্গে গেলেন, পাহাড়ের উচ্চ এক উপত্যকায় উঠলেন কোনো দ্বিধা না করেই।

রাজবাড়ির ভগ্নাবশেষ দেখাবার পর দোবরু পান্না রাজবংশের সমাধিস্থলও দেখালেন। প্রকাণ্ড রাজবাড়ির জীর্ণ ভগ্নাবশেষ এখনো প্রাচীন রাজবংশের গৌরব ঘোষণা করছে— দোবরুর পূর্বপুরুষেরা এখানে বাস করতেন—একথা বলতে দোবরু পান্নার বেশ গর্ববোধ হয়। পূর্বপুরুষদের প্রতিষ্ঠিত দেবতা এখনো সেখানে আছেন। ঝুলন উৎসবের ব্যাপারও তাঁর বংশগৌরবের চিহ্নস্বরূপ।

সত্যচরণ দোবরু পান্নার পুরাতন আভিজাত্য গৌরবের স্মারক দেখে অভিভূত যে হয়েছিলেন, তা তাঁর উপলব্ধিতে প্রকাশিত হয়েছে, "অপরাহ্নের সেই ঘনায়মান ছায়া এই সুপ্রাচীন রাজ-সমাধিকে যেন আরও গম্ভীর, রহস্যময় সৌন্দর্য দান করিল।"

দোবরু দেবতায় বিশ্বাসী, তাঁদের কুলদেবতা হচ্ছেন টাঁড়বারো। তিনি বন্য মহিষের দেবতা। তিনি জাগ্রত দেবতা—দোবরু এই দেবতাকে খুব বিশ্বাস করেন। এই টাঁড়বারো বুনো মহিষদের শিকারী মানুষের পাতা ফাঁদ থেকে রক্ষা করেন।

বৈষ্ণবের কাণাকড়ি যার অবশিষ্ট নেই, সম্বল বলতে যার গোচারণ, সেই মানুষও বংশগৌরবের কথা বললে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে, অতিথিকে আপ্যায়নের জন্য রাজকীয় গাম্ভীর্যে নির্দেশ দেয় এবং নিজেদের পুরাকীর্তি যত্নসহকারে ঘুরে দেখায় অতিথিকে।

চরিত্রের এই গভীর আভিজাত্যবোধ এবং সম্ভ্রমবোধের কারণেই একটি অতি বৃদ্ধ সাঁওতাল চরিত্র এই উপন্যাসে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। দোবরু বর্তমানে নিঃস্ব হলেও আভিজাত্য ও বংশমর্যাদার স্বরূপ তার চরিত্রে বর্তমান।

উপন্যাসের শেষে সত্যচরণ জানিয়েছেন, "পথের ধারে কোথাও রাজকুমারী ভানুমতী যেন দাঁড়াইয়া আছে—বালিকা নয়, যুবতী ভানুমতী—তাহাকে আমি কখনও দেখি নাই। তার সাগ্রহ দৃষ্টি, তার প্রণয়ীর আগমন পথের দিকে নিবদ্ধ—হয়তো সে পাহাড়ের ওপারের বনে শিকারে গিয়াছে, আসিবার দেরি নাই। তরুণীকে মনে মনে আশীর্বাদ করিলাম। ধনঝরি পাহাড়ের জোনাকি-জ্বলা নিস্তব্ধ প্রাচীন ছাতিম ফুলের বন ও অপূর্ব দূরছন্দা সন্ধ্যার আড়ালে বনবালার গোপন অভিসার সার্থক হউক।"

সত্যচরণের রোমান্টিক মনের স্বরূপ জানতে গেলে অনার্য রাজার কাহিনীর যৌক্তিকতা তাই কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। এককালের রাজা যে দরিদ্র হয়ে যায়—এই সত্যটিকে উপস্থাপনা এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে অরণ্যের পরিবর্তন যে অবশ্যম্ভাবী সে দিকটিও চিত্রিত করার জন্য বিভূতিভূষণ এই কাহিনীর অবতারণা করেছেন।

॥ এগারো ॥

আরণ্যক ঃ মৃত্তিকাশ্রিত জীবনের বাস্তবতা

বিভূতিভূষণ উপন্যাসের শুরুতেই 'আরণ্যক' উপন্যাস যে বহুবিচিত্র মৃত্তিকাশ্রিত মানুষের বাস্তব জীবনযাত্রার ছবি তা সত্যচরণের স্মৃতিচারণা সূত্রে জানিয়েছেন—"শুধু বনপ্রান্তর নয়, কত ধরনের মানুষ দেখিয়াছিলাম। কুন্তা—মুসম্মত কুন্তার কথা মনে হয়। ..... মনে হয় ধাতুরিয়ার কথা ..... নাটুয়া বালক ধাতুরিয়া। ..... মনে পড়ে সরল মহাজন ধাওতাল সাহুকে। ..... কত অতি দরিদ্র বালক-বালিকা, নরনারী, কত দুর্দান্ত প্রকৃতির মহাজন, গায়ক, কাঠুরে, ভিখারীর বিচিত্র জীবনযাত্রার সঙ্গে পরিচয় হইয়াছিল। ... ইহাদের কথা বলিব।"

'আরণ্যক'-এর প্রেক্ষাপট চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের শেষ অধ্যায়ের কথা। জমিদাররা ক্ষয়িত হলেও নতুন জমিদারী কেনার উৎসাহ তখনো বর্তমান। তাই নতুন সৃষ্ট নদীর চর বা দিয়ারা অঞ্চল সৃষ্টি হলেই শহরের জমিদাররা তাদের চিরকালীন গভীর বাসনা নিয়েই জমি কিনে নিতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। তাছাড়া চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের নীতি অনুসারে জমিদাররা অরণ্য ধ্বংসের মাধ্যমে সৃষ্ট ভূসম্পত্তি, নদীগর্ভ থেকে উত্থিত জমি থেকে প্রাপ্ত লভ্যাংশ ভোগ করার অধিকার পেয়ে যাওয়ায় তাঁরা অবাধে বিভিন্ন কৃষিকেন্দ্রিক জীবিকার মানুষকে প্রথমে প্রলুব্ধ করে এবং পরে তাদের শোষণ করে মুনাফা অর্জনে কৃতকার্য হয়েছিলেন। আর এইসব জমি চাষ ও চারণভূমির ব্যবহারের কারণে নানান যাযাবর ও বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের আগমন ও তাদের বসবাসকে কেন্দ্র করে ভূমিকেন্দ্রিক জীবনের বাস্তব চিত্র উপহার দিয়েছেন বিভূতিভূষণ।

উপন্যাসের প্রারম্ভে লেখক জমিদারী সম্পর্কে তাঁর নিজের কর্তব্যের ও জমি বিলি ব্যবস্থার একটি সংকেত দিয়েছেন, যার দ্বারা ভূমিসংলগ্ন মানুষ ও তাদের অবস্থানের

দিকটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যেমন, "যাহারা পিতৃ-পিতামহের জমি গঙ্গায় ভাঙিয়া যাওয়ার পরে অন্যত্র উঠিয়া গিয়া বাস করিয়াছিল, সেই পুরাতন প্রজাদিগকে জমিদার এইসব জমিতে দখল দিতে চাহিতেছেন না। মোটা সেলামী ও বর্ধিত হারে খাজনার লোভে নূতন প্রজাদের সঙ্গেই বন্দোবস্ত করিতে চান। অথচ যে সব গৃহহীন, আশ্রয়হীন, অতি দরিদ্র পুরাতন প্রজাকে তাহাদের ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে। তাহারা বারবার অনুরোধ উপরোধ কান্নাকাটি করিয়াও জমি পাইতেছে না। ....

তাহাদের অবস্থা দেখিলে কষ্ট হয়, কিন্তু জমিদারের হুকুম কোন পুরাতন প্রজাকে জমি দেওয়া যাইবে না। কারণ একবার চাপিয়া বসিলে তাহাদের পুরাতন স্বত্ব তাহারা আইনত দাবী করিতে পারে। জমিদারের লাঠির জোর বেশী, প্রজারা আজ বিশ বৎসর ভূমিহীন ও গৃহহীন অবস্থায় দেশে দেশে মজুরী করিয়া যায়, কেহ সামান্য চাষবাস করে, অনেকে মরিয়া গিয়াছে, তাহাদের ছেলেপিলে নাবালক বা অসহায় — প্রবল জমিদারের বিরুদ্ধে স্রোতের মুখে কুটার মত ভাসিয়া যাইবে।"

'আরণ্যক' মৃত্তিকাশ্রয়ী বাস্তব জীবনের দলিল। অরণ্য-প্রকৃতির এক বিশেষ অঞ্চলের গাছপালা, আকাশ, আলো-অন্ধকারের কথা যেমন আছে, তেমনি আছে বিশাল অরণ্য প্রান্তরে লালিত-পালিত বিচিত্র চরিত্রের মানুষজন। কেউ কেউ অরণ্যের আদিম সন্তান, কেউ বা বহিরাগত, কিন্তু অরণ্যে এসে তারা অরণ্যেরই লোক হয়ে গেছে।

আকাশ, আলো, বনস্পতি, পর্বতমালা, সূর্যাস্তের রঙ, জ্যোৎস্নার প্লাবন, নিবিড় অরণ্যানী—এসবের বর্ণনায় বিভূতিভূষণ আত্মতন্ময় রোমান্টিক, কিন্তু উপন্যাসের প্রধান শর্ত যে চরিত্রসৃষ্টি—সেখানে তিনি পুরোপুরি বাস্তব। মাটির কাছাকাছি আছে যে মানুষটি, তার সুখ-দুঃখ বিজড়িত জীবনের ধারায় সে মগ্ন থেকেছে, বস্তুগত জীবনের ধারা থেকে এতটুকু সে সরে আসেনি।

'আরণ্যকে'র একদিকে যেমন লেখকের ধ্যাননিবিষ্ট প্রকৃতি-পূজা—যা তাঁর রোমান্টিক মনের ফসল, অন্যদিকে তেমনি উপন্যাসটির মানুষজন সব বাস্তব সংসারের বাসিন্দা। প্রত্যেকটি চরিত্রের নামগুলি একেবারে বাস্তব জীবন থেকে আহৃত বলেই মনে হবে। মুনেশ্বর সিং, আসরফি টিণ্ডেল, গনু মাহাতো, রাজু পাঁড়ে, বেজ্জটেশ্বর প্রসাদ, নকছেদী ভকত, দোবরু পান্না বীরবর্দী, মটুকনাথ, যুগলপ্রসাদ, ধাতুরিয়া, গিরিধারীলাল, ব্রহ্মা মাহাতো, মঙ্গী, মুসম্মত কুন্তা, ভানুমতী প্রভৃতি এই নামগুলির সঙ্গে স্থানের নামও বাস্তব সম্মতভাবে উপস্থাপিত হয়েছে—লবটুলিয়া বইহার, আজমাবাদের জঙ্গল, নাড়া-বইহার, ফুল-বইহার, ধনঝরি পাহাড়, মহালিখারূপ পর্বত, মোহনপুরা ফরেস্ট, কুশী নদী, কলবলিয়া নদী, মৈষণ্ডির মেলা, সরস্বতী কুণ্ডী, কড়ারী গ্রাম, তিনটাঙা, লছমনিয়াটোলা প্রভৃতি।

শুধু নাম-ব্যবহারের মধ্যেই বাস্তবতার আমেজ নয়, উপন্যাসটির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বাস্তব জীবনের ছবিই আঁকা হয়েছে। কাছারি বাড়িতে ম্যানেজার আসবেন জেনে ভাত খাবার লোভে যে গরিব মানুষেরা চোদ্দ পনেরো মাইল পথ হেঁটে এসে জড়ো হয়—প্রধানত এই দৃশ্য দিয়েই উপন্যাসের বাস্তব জীবনের দলিল রচনা। বহুদূর থেকে অন্নলোভী বুভুক্ষু মানুষ দুদিন ধরে কাছারি বাড়িতে এসে বসে আছে—ভাত খেতে পাবে, শুধু সেই লোভে। এরা বড় গরিব, ভাত জিনিসটা খেতে পায় না—কলাই এবং মকাই-এর ছাতুই বারোমাস খায়।

প্রচণ্ড শীতে গায়ে দেবার বস্ত্র পর্যন্ত সেখানকার মানুষের নেই, রাত্রে আগুন পোহায়, শেষরাতে আগুনের খুব কাছে ঘেঁষে বসে। মানুষ হিসেবে এরা বড় সরল, তঞ্চকতা জানে না, অমার্জিতও এরা নয়। এদের দেখলে, এদের পরিচয় পেলে, সহৃদয় মানুষ এদের ভালো না বেসে পারবেন না। সত্যচরণও প্রথম দর্শনেই এদের ভালোবেসেছেন। "কেন জানি না, ইহাদের হঠাৎ এত ভালো লাগিল। ইহাদের দারিদ্র্য, ইহাদের সারল্য, কঠোর জীবন-সংগ্রামে ইহাদের যুঝিবার ক্ষমতা—এই অন্ধকার আরণ্যভূমি ও হিমবর্ষী মুক্ত আকাশ বিলাসিতার কোমল পুষ্পাবৃত পথে ইহাদের যাইতে দেয় নাই, কিন্তু ইহাদিগকে সত্যকার পুরুষমানুষ করিয়া গড়িয়াছে। দুটি ভাত খাইতে পাওয়ার আনন্দে যারা ভীমদাসটোলা হইতে ন' মাইল পথ হাঁটিয়া আসিয়াছে বিনা নিমন্ত্রণে—তাহাদের মনের আনন্দ গ্রহণ করিবার শক্তি কত সতেজ ভাবিয়া বিস্মিত হইলাম।"

প্রকৃতিলোকের বর্ণনায় লেখকের কল্পনা সুন্দর রোমান্টিকতার প্রকাশ যেমন ঘটেছে, চরিত্র চিত্রণের ক্ষেত্রে তিনি বাস্তবকে ছাড়িয়ে যান নি; মাটির পৃথিবীর সঙ্গে যোগ রেখেই চরিত্রগুলিকে আঁকা হয়েছে। উপন্যাস-লেখকেরা বস্তুধর্মী চরিত্রকেই অবলম্বন করে উপন্যাস লেখেন, উপন্যাসে তাই চরিত্রকেন্দ্রিক জীবনজিজ্ঞাসা থাকে, আর সেই জীবনজিজ্ঞাসা বাস্তবমুখী হবে, কোনো তুরীয় মার্গের বা উদ্ভট কল্পনার সামগ্রী যেন না হয়। বলাবাহুল্য, সেই উদ্ভট কল্পনাও উপন্যাসে নেই।

বিভূতিভূষণের কল্পনা, অন্তর্দৃষ্টি এবং জীবনবোধ বাস্তবকে ছেড়ে যায় নি। কল্পনার যেখানে প্রাধান্য সেখানেও দেখা যাবে সম্ভাব্যতা বজায় রয়েছে, কোনো উদ্ভট কাল্পনিকতা বাস্তবিকতার রস নষ্ট করেনি। উপন্যাসে বর্ণিত মানুষগুলির দুঃখ-সুখের কথা চোখে দেখা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাপ্রসূত এবং বাস্তব। তাই 'আরণ্যক'কে বাস্তব জীবনের দলিল বলে কেউ কেউ বর্ণনা করেছেন।

কেননা এরা মূলত অর্ধ-যাযাবর শ্রেণীর মানুষ, এদের জীবনে কোনো বন্ধন নেই, এদের নিজস্ব কোনো সমাজ নেই, পিতৃপিতামহের ভিটার কোন মায়াও নেই এদের কাছে। কেউ আসে সস্তায় জমি নিতে, চাষ করতে। আবার কেউ আসে চাষ করতে, মহিষ চরাতে, কোনরকমে কোনো কাজ করে জীবনটা কাটিয়ে দিতে। এদের সকলের বাস্তব জীবনচিত্র হল 'আরণ্যক' উপন্যাস, তারা অরণ্যভূমির by product।

॥ বারো ॥

আরণ্যক ঃ প্রাকৃতিক পরিবেশের বিনষ্টি

প্রকৃতিপ্রেমিক বিভূতিভূষণ অরণ্য ও অরণ্য সংলগ্ন মানুষের চিত্র আঁকতে গিয়ে 'আরণ্যক' উপন্যাসে অরণ্য প্রকৃতির ধ্বংসের দিকটিও সত্যচরণের স্বীকারোক্তির মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন এভাবে, "বিস্মৃতপ্রায় অতীতের যে নাঢ়া ও লবটুলিয়ার আরণ্য-প্রান্তর আমার হাতেই নষ্ট হইয়াছিল, সরস্বতী হ্রদের সে অপূর্ব বনানী, তাহাদের স্মৃতি স্বপ্নের মত আসিয়া মাঝে মাঝে মনকে উদাস করে।" সত্যচরণের কাছে এই স্বীকারোক্তি বিলীয়মান প্রকৃতির ট্র্যাজেডি।

"উত্তরে আজমাবাদ হইতে দক্ষিণে বিষ্ণুপুর, পূর্ব্বে ফুলকিয়া বইহার ও লবটুলিয়া হইতে পশ্চিমে মুঙ্গের জেলার সীমানা" পর্যন্ত জঙ্গলের কথা আরণ্যকে রয়েছে। ভৌগোলিক দিক থেকে এই জায়গাটা কুশী নদীর দক্ষিণে আর গঙ্গার উত্তরে, ভাগলপুর জেলার উত্তরাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত। এই স্থানগুলি নদীর গতিপথ বদলানোর কারণে যে চর সৃষ্টি হয়, যা ঐসব অঞ্চলে 'দিয়ারা' নামে খ্যাত—তা-ই ছিল সত্যচরণের জমিদারির এলাকা। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুবাদে শহরে স্থিত জমিদাররা ঐসব চর-জঙ্গল ভূমি চাষ আবাদের জন্য লিজ দিতে পারত এবং লোক আনিয়ে বন কেটে চাষের ভূমি ও চারণভূমি সৃষ্টি করে জমিদাররা লভ্যাংশ পেত।

একশ্রেণীর অর্ধ-যাযাবর মানুষ ছিল, যারা নূতন চর বা জঙ্গল বিলি হচ্ছে শুনলেই সেখানে গিয়ে চাষবাসের জন্য জমি নিয়ে জঙ্গল কেটে কুমারী ভূমিকে ফসল ফলানোর উপযোগী করে গড়ে তুলত। এদের জীবনের উদ্দেশ্যই ছিল আরণ্য প্রকৃতির ধ্বংস-সাধন। এরা জমিদারের কাছ থেকে সেলামি দিয়ে জমি গ্রহণ করে বহু শত বৎসর ধরে গড়ে ওঠা প্রকৃতির অতুলনীয় সৌন্দর্য সম্ভার নিঃশেষে বিলুপ্ত করে ফেলত। এর ফলে হাজার হাজার বিঘা জমির গাছ ধ্বংস করার ফলে প্রাকৃতিক সম্পদের বিনাশ ঘটত, সৃষ্টি হত খরা ও দুর্ভিক্ষ।

ঔপনিবেশিক ইংরেজের অরণ্যনীতির মধ্যেই ছিল অরণ্য পরিবেশ বিনষ্টির কারণ। মধ্যস্বত্বভোগীদের মুনাফা লাভের সুযোগ করে দিয়ে ইংরেজরাই পরোক্ষভাবে অরণ্য পরিবেশকে অশুচি করেছিল—যার বাস্তব ও ঐতিহাসিক দিকটি মহাশ্বেতা দেবী 'অরণ্যের অধিকার' উপন্যাসে চিত্রিত করেছেন। রাসবিহারী সিং-রা শুধু অরণ্য নিধন করেই ক্ষান্ত হয়নি, অরণ্য রমণীকেও ধর্ষণ করেছে। অরণ্যের বিনষ্টির যে দিকগুলি উপন্যাসে রয়েছে সেগুলি হল ঃ

(এক) যে লবটুলিয়া একসময় অরণ্যসম্পদ ও সৌন্দর্যে ভরপুর ছিল, তা আর পুরোনো অবস্থায় না থাকায় তাকে ঔপন্যাসিক 'নয়া লবটুলিয়া' বলেছেন। কারণ এই লবটুলিয়াতে অরণ্য ধ্বংস করে চাষবাস শুরু হয়েছে, বাইর থেকে লোকজন জীবন জীবিকার প্রয়োজনে এসে অরণ্যের শান্ত সমাহিত পরিবেশকে ধ্বংস করে দিচ্ছে।

(দুই) চাষবাসের জন্য বসতি করতে গিয়ে জঙ্গলের বেশির ভাগ বাড়ী কাশ দিয়ে ছাওয়া, কাশ ডাঁটার বেড়া এবং পিয়াল, কেঁদ ডালের বাতা, খুঁটি ও আড়া দিয়ে ঘর প্রস্তুত করতে গিয়ে অরণ্য ধ্বংস হল।

(তিন) বনের গাছ কাটার ফলে জঙ্গলে গ্রীষ্মে জলকষ্টের বর্ণনা দিয়েছেন সত্যচরণ। জঙ্গলের যত খাল, ডোবা, জলাশয় সব শুকিয়ে গিয়েছিল, কুঁয়া খুড়লেও জল পাওয়া যেত না। কাছারি থেকে সাত আট মাইল দূরে কুশী নদীতে গিয়ে জল আনতে হত।

(চার) বিস্তৃত বনভূমি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে উপলব্ধি করে অরণ্যের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য যুগলপ্রসাদ ফুলের বীজ, গাছ বিভিন্ন জায়গায় পুঁতে দিত।

(পাঁচ) সত্যচরণও জঙ্গলমহালে প্রজাবিলির কাজ দ্রুত করেননি। তার কারণও অরণ্য ধ্বংস হওয়াটা—তিনি এত দ্রুত মেনে নিতে পারেন নি। তিনি প্রজা বসিয়ে প্রকৃতির এমন নিভৃত কুঞ্জবনকে নষ্ট করতে চাননি। কেননা যারা জমির ইজারা নেবে,

তারা তো জমিতে গাছপালা বনঝোপ সাজিয়ে রাখার জন্য কিনবে না। তারা জমি কিনে জমি পরিষ্কার করে, ফসল রোপন করে ঘরবাড়ি বেঁধে বসবাস শুরু করবে। তখন নির্জন শোভাময় বন্যপ্রান্তর, অরণ্য, কুণ্ডী, শৈলমালা জনপদে পরিণত হবে এবং লোকের ভিড়ে ভয় পেয়ে বনলক্ষ্মীরা ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করবে তখন সেই মায়াকাননের মায়া ও সৌন্দর্য দুই-ই নষ্ট হবে।

(ছয়) নাঢ়া বইহার গাছ, লতাপাতা, জন্তু, পাখীদের আবাসস্থল হলেও তার সৌন্দর্য সত্যচরণকে মুগ্ধ করলেও তিনি জানিয়েছেন, "এত ভালবাসি ইহাকে অথচ আমার হাতেই ইহা বিনষ্ট হইল।" এস্টেটের ম্যানেজার হয়ে আসার পর জমি বিলি করে নাঢ়া বইহার-এর অতুলনীয় বন্য সৌন্দর্য যে সত্যচরণ নিজের হাতে বিনষ্ট করেছেন সেই ক্ষোভও তাঁর কথায় প্রকাশিত হয়েছে। প্রকৃতির নিজের হাতে সাজানো তার শত বৎসরের সাধনার ফল তিনি নিজের হাতেই বিনষ্ট করেছেন। সেজন্য সেখানে জঙ্গল পরিষ্কার করে গড়ে উঠেছে খুপরি ঘর, গোয়াল, মকাই জনারের ক্ষেত, দড়ির চারপাই, দোক্তা, খৈনি, কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি। তাই সত্যচরণ আক্ষেপ করে বলেছেন, 'হে অরণ্য, হে সুপ্রাচীন, আমায় ক্ষমা করিও।' এমনকি প্রকৃতির স্বতঃস্ফূর্ত কুঞ্জ জনমজুরেরা তাদের নির্মম হাতে কেটে উড়িয়ে দিয়েছে। তাই সেখানে আর রহস্যময় দূরবিসর্পী প্রান্তর নেই, জ্যোৎস্নালোকিত রাতে যেখানে মায়াপরীরা নামত, মহিষের দেবতা টাঁড়বারো হাত তুলে দাঁড়িয়ে বন্য মহিষদের ধ্বংস থেকে রক্ষা করত—তা আর নেই।

অরণ্য ধ্বংসের পর লবটুলিয়া বইহার এখন একটি বস্তি মাত্র। সত্যচরণের উপলব্ধি, 'লবটুলিয়া বইহারে আর এতটুকু বনজঙ্গল ও গাছপালা নাই, নাঢ়া বইহারের শোভাময়ী বনভূমির বারো আনা গিয়াছে,.....।'

(সাত) ভানুমতীকে ঘিরে সত্যচরণের স্বপ্ন সম্ভাবনার মধ্যে উঠে এসেছে অরণ্যের বিনষ্টি থেকে অরণ্যকে উদ্ধারের আশা। তাই সত্যচরণ জানিয়েছে, "লবটুলিয়া গিয়াছে, নাঢ়া ও ফুলকিয়া বইহার গিয়াছে — কিন্তু মহালিখারূপের পাহাড় রহিল—ভানুমতীদের ধনঝরি পাহাড়ের বনভূমি রহিল। এমন সময় আসিবে হয়তো দেশে, যখন মানুষে অরণ্য দেখিতে পাইবে না — শুধুই চাষের ক্ষেত আর পাটের কল, কাপড়ের কলের চিমনি চোখে পড়িবে, তখন তাহারা আসিবে এই নিভৃত অরণ্য প্রদেশে, যেমন লোকে তীর্থে আসে। সেই সব অনাগত দিনের মানুষদের জন্য এ বন অক্ষুণ্ণ থাকুক।"

সভ্যতার অগ্রগতির জন্য অরণ্য ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু সত্যচরণের বন ধ্বংসের জন্য যে দীর্ঘশ্বাস তা আসলে মনুষ্যের অতিরিক্ত লোভের স্বরূপকেই উদ্ঘাটিত করে। জমিদাররা যদি মুনাফার জন্য লোক এনে জঙ্গল কেটে চাষবাস ও বসতি স্থাপন না করত তাহলে অরণ্যের এতবড় ধ্বংস সাধন এত তাড়াতাড়ি ঘটত না। আধুনিক সভ্যতার অগ্রগতি মানেই তো অরণ্য ধ্বংস, নগরায়ন ও বিশ্বায়ন তো তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়, কিন্তু 'পথের পাঁচালী'র লেখক বিভূতিভূষণ প্রকৃতি ও মানুষকে অঙ্গাঙ্গীভাবে রেখে প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর হতাশা ও অনিকেত মনোভাবকে মুছে ফেলতে চান, আর সে কারণেই আরণ্যের এই বিনষ্টি সত্যচরণ ও তাঁর স্রষ্টাকে বড্ড বেশি ভাবিয়ে তোলে। আজকের দিনের পাঠককে তো তা আরো বেশি অনুপ্রাণিত করবে।

॥ তেরো ॥

আরণ্যক ঃ গাঙ্গোতাদের জীবনের বাস্তব দলিল

আরণ্যক বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের চিত্রশালা। এর মধ্যে গাঙ্গোতারা উপন্যাসে এসেছে জীবিকার জন্য বনজঙ্গল কেটে চাষবাসের জন্য। গঙ্গাতীরে বাস বলেই এদের নাম গাঙ্গোতা। এরা আদিতে ছিল গোয়ালা। এদের জাতব্যবসা গোপালন হলেও পরে তারা চাষবাসের দিকে ঝুঁকেছে। এরা মূলত যাযাবর। নকছেদী, বিশুয়া, গনু, গিরিধারীলাল সকলেই গাঙ্গোতা। বিশ শতকের দ্বিতীয় তৃতীয়-দশকে গঙ্গাতীরের বিহার যে গাঙ্গোতাদের বাস ছিল, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এরাই নতুন দিয়ারা বা নদীর চর সৃষ্টি হওয়ায় জীবিকার প্রয়োজনে চাষবাস, বনকর্তন, পশুপালন প্রভৃতি কাজের জন্য জমিদারদের আহ্বানে কিম্বা নিজেদের উপার্জনের জন্য জমিদারের কাছারিতে পৌঁছে যেত ও জমিদারের কাছ থেকে সেলামি নিয়ে জমিকে চাষের উপযোগী করে পরে চাষবাস করত। এদের বাস্তব জীবনচিত্র লেখক উপন্যাসে অঙ্কন করেছেন।

অরণ্য ভূভাগে গাঙ্গোতা জাতির মানুষের বসবাসই বেশি। তাই অরণ্য জাতের মানুষের তুলনায় গাঙ্গোতাদের জীবনের কথা বেশি আছে। গাঙ্গোতারা নীচ অস্পৃশ্য জাতি। গাঙ্গোতাদের উপজীবিকা চাষবাস ও পশুপালন। গনু মাহাতো একাই জঙ্গলে থেকে মোষ চরায়, তাঁর পাঁচটা মোষ আছে, দশ ক্রোশ দূরে লছমানিয়াটোলা থেকে এখানে মাত্র পাঁচটি মোষ চরাবার জন্যে এসেছে। এরা কঠোর পরিশ্রমী ও সাহসী। কোনরকমে জীবন কাটিয়ে দিতে পারে। গনু মাহাতো মোষের ঘি প্রস্তুত করে নয় মাইল দূরে মাড়োয়ারীর কাছে বেচে আসে।

গাঙ্গোতারা নিজেদের ভাগ্যকে মেনে নেয় সহজে। সেই তাদের কাজ এবং তা করতেই হবে। সেজন্যে কর্মে শৈথিল্য নেই, ভাগ্যের প্রতিও কোনো দোষারোপ নেই। গাঙ্গোতারা ঈষৎ স্বভাব-ভীরু। তাই লাঠিয়াল মহাজনকে বড় ভয় করে, শোষিত এবং নিপীড়িত হলেও কিছু বলে না, নীরবে নির্যাতন সহ্য করে।

খেড়ীর দানা সেদ্ধ আর বুনো বেথুয়া শাক সেদ্ধ লবণ দিয়ে খায়, ভাত খেতে পায় না, বসন্তকালে গুড়মী ফল খুব ফলে, লবণ দিয়ে গাঙ্গোতারা তখন ঐ ফল কাঁচা খায়।

মোষ চরাবার জন্য এরা প্রচুর পরিশ্রম করে। এমনিতেই গাঙ্গোতারা পরিশ্রমী হয়। বিশুয়া নামে দশ বছরের একটা গাঙ্গোতা ছেলে কাছারির পুণ্যাহ-উৎসবে প্রচুর খেটেছিল। এই উৎসবে তারা বেশ আনন্দ করে।

ফুলকিয়া গ্রামের গাঙ্গোতারাও জঙ্গলে মোষ চরায়, সারাদিন ভূতের মতো খাটে, আর সন্ধ্যের সময় কলাই-এর ভুসির আগুন জ্বেলে সবাই বসে গল্পগুজব করে, খৈনি খায় অথবা 'শাল-পাতার পিকার ধূমপান' করে।

লাঠিকে গাঙ্গোতারা বড় ভয় করে। এরা বড় বিনয়ী হয়। ব্রহ্মা মাহাতোর কর্মচারী গিরিধারীলাল গাঙ্গোতা জাতির লোক, নম্র স্বভাব এবং সাচ্চা মানুষ, খাজনা আদায়ের ভার তার ওপর, কিন্তু একটা পয়সা সে এদিক-ওদিক করে না। এই উপন্যাসে কোনো গাঙ্গোতারই চরম অসাধুতার রূপ কোথাও দেখা যায়নি।

অল্প খাদ্যেই এরা তুষ্ট। চীনা ঘাসের ভাজা দানা আর দই—রাসবিহারী সিং-এর বাড়িতে খেতে পেয়েই এরা পরম পরিতৃপ্ত।

আদিম সংস্কার এবং অন্ধ বিশ্বাস নিয়েই তারা জীবন অতিবাহিত করে, কোনো অভিযোগ থাকে না, অবিশ্বাস থাকে না, যুক্তি দিয়ে কোনো কিছু যাচাই করার প্রবণতা নেই; তাই বন্য মহিষের দেবতা টাঁড়বারোকে ভক্তি করে, দেবজ্ঞানে শ্রদ্ধাও জানায়।

গাঙ্গোতারা কাটুনি মজুরের কাজ করে; যখন যেখানে যে ফসল পাকে, তখন সেখানে সেই ফসল কাটার জন্যে যায়। ছোট কুঁড়েঘর বানিয়ে স্ত্রী-পুরুষ বালবাচ্চা থাকে, ফসল কাটে, মজুরি হিসাবে ফসলের একটা অংশ পায়। ফসল কাটা শেষ হলে কুঁড়ে ফেলে রেখে চলে যায়, পরের বছর আবার আসে। নকছেদী ভকত, মঞ্চী প্রভৃতিরা এই জাতীয় কাটুনী শ্রমিক। যেখানে ধান হয় সেখানে গিয়ে ধান কাটে, তারপর আসে এই অরণ্য-অঞ্চলে, গম কাটে, গমের পর খেড়ী কাটার সময় এসে যায়। তারপরে আবার কলাই, মকাই। বছরের দুতিন মাস ছাড়া সবসময়ই ফসল কেটে বেড়াতে হয়।

এই অরণ্য ভূভাগে তখন মুদ্রার বিনিময়ে কেনাকাটার চল হয়নি। বিনিময় প্রথায় গাঙ্গোতারা কেনাকাটা করে। ফসলের অংশ যা তারা শ্রমের বিনিময়ে পায় তাই দিয়েই কেনাকাটা চলে। ফসল কাটার মরসুম শেষ হতে না হতেই নানা দোকানীরা এসে যায়, মেলার মতো জমজমাট কেনাবেচা চলে, গাঙ্গোতাদের ঠকানো হয়। পুরুষেরা বিলিতি সিগারেট কেনে, জামা জুতোও কেনে; মেয়েরা কেনে রঙিন কাপড়, চিরুনি, লাল ফিতে, কাঁচের, এনামেলের বাসন। লাড্ডু মেঠাই কিনেও খায়। এক আনা দামের জিনিসের বদলে পাঁচ ছ'আনার সর্ষে দিতে হয়, ঠকে তারা। সারা বছর অপরিসীম কষ্ট করে, সাপ বাঘের মুখ থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে যা উপায় করে, পনেরো দিনেই তা শেষ করে দেয় এরা। সারা বছর আবার সেই গতানুগতিক পরিশ্রম।

অরণ্য-পরিবেশের অংশ হিসেবেই গাঙ্গোতাদের জীবনের বিস্তৃত পরিচয় 'আরণ্যক' উপন্যাসে লেখক দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, অরণ্য জীবনে গাঙ্গোতারা যে উপযুক্ত এবং তারা যে অপরকে প্রভাবিত করবে তা সত্যচরণ রাখালবাবুর স্ত্রীর বিধবা হওয়ার পর তাদের অবস্থা দেখে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। আসলে গাঙ্গোতারা শিক্ষা সংস্কৃতি থেকে দূরে থেকে শুধু জীবিকার প্রয়োজনে তাদের জীবনধারণকে লেখক বাস্তবসম্মত রূপে উপস্থাপিত করেছেন। সেজন্য সত্যচরণ রাখালবাবুর মৃত্যুর পর তাদের পরিবারের অবস্থা সম্পর্কে বলেছেন, "বছর কয়েক পরে চাষী গাঙ্গোতায় পরিণত হইবে—ভাষায়, চালচলনে, হাবভাবে।" সুতরাং গাঙ্গোতাদের জীবন শুধু পরিশ্রমের ও ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য, তাদের না আছে শিক্ষা, না আছে সংস্কৃতি। উপন্যাসে তাদের আগমন বনকাটা ও চাষবাসের জন্যই—অরণ্য পরিবেশের পরিবর্তনের জন্যই।

॥ চৌদ্দ ॥

আরণ্যক ঃ আঞ্চলিকতার রূপায়ণ

'আরণ্যক' উপন্যাস একটি বিশেষ অঞ্চলকে নিয়ে লেখা, সেই বিশেষ অঞ্চলের প্রকৃতি ও মানুষের কথাই উপন্যাসটির উপজীব্য বিষয়। ভৌগোলিক প্রতিবেশটিও নির্দিষ্ট—পরিকাঠামোর দ্বারা সীমাবদ্ধ। ফলে এই উপন্যাসকে 'আঞ্চলিক' বলে কোনো কোনো সমালোচক চিহ্নিত করেছেন।

'আরণ্যক' উপন্যাসের ভৌগোলিক পটভূমি হল ঃ "উত্তরে আজমাবাদ হইতে দক্ষিণে বিষ্ণুপুর—পূর্ব্বে পুলকিয়া বইহার ও লবটুলিয়া হইতে পশ্চিমে মুঙ্গের জেলার সীমানা" পর্যন্ত জঙ্গলমহাল। ভৌগোলিক দিক থেকে জায়গাটা কুশী নদীর দক্ষিণে আর গঙ্গার উত্তরে, ভাগলপুর জেলার উত্তরাংশে। 'আরণ্যক' উপন্যাসে সত্যচরণের বিবরণ থেকে যে নাম পাওয়া যায় তার বেশির ভাগটাই ভাগলপুর এলাকার অন্তর্গত। এই বিশেষ অঞ্চল আঞ্চলিক উপন্যাসের শর্ত পূরণ করে।

জঙ্গলে নতুন জমির উৎপত্তি এবং একে ঘিরে চাষবাস, জমিদারী ব্যবস্থা, প্রজা আগমন, জমি বিলির ঘটনা আঞ্চলিক উপন্যাসের বৈশিষ্ট্যকে প্রমাণ করে। ভাগলপুরের উত্তরাঞ্চলে যে এমন জমি ছিল, সে কথা ১৯১১-র ভাগলপুর গেজেটিয়ারে উল্লিখিত রয়েছে। এমনকি ভাগলপুর ও পূর্ণিয়া গেজেটিয়ারে যে বিশেষ ভূমিব্যবস্থা হালহাসিলার কথা বলা হয়েছে তারও পরিচয় পাই উপন্যাসে।

আঞ্চলিক উপন্যাস যখন একটি অঞ্চলকেন্দ্রিক হয়, তখন সেই অঞ্চলের ভাষা অর্থাৎ সেখানকার উপভাষা (dialect) চরিত্রাবলীর মুখে উচ্চারিত হবে। যেমন,

"—কি হবে বাবুজী? আমরা গরীব গাঙ্গোতা কাটনি মজুর। আমাদের ফরিয়াদ কে শুনবে। আমি বলি, কাঁদিস্ নে, তোকে আমি মুঙ্গেরের সীতাকুণ্ডে নাইয়ে আনবো।"

অবশ্য 'আরণ্যক'-র ওই অঞ্চলের দেহাতী হিন্দি বুলি—তার কথা লেখক উল্লেখ করলেও চরিত্রগুলির মুখে সেই ভাষা ব্যবহার করেন নি। সেজন্যে এই উপন্যাসের আঞ্চলিকতার দাবী খারিজ হয়ে যাচ্ছে, তাও নয়।

ভৌগোলিক পরিসীমায় বাঁধা অঞ্চলের সামাজিক রীতিনীতির ছবিও আঞ্চলিক উপন্যাসে থাকে। 'আরণ্যক'-এ যে সামাজিক রীতির কিছু চিত্র নেই—তা নয়, বেশ কিছু জীবনকেন্দ্রিক সামাজিক রীতির কথা আমরা এই গ্রন্থপাঠে জানতে পারি।

মৈষণ্ডির গ্রাম্যমেলার চিত্রটি আমাদের একবার স্মরণ করা যাক। মেলায় হঠাৎ মেয়েদের গলায় আর্ত কান্নার স্বর শোনা গেল, দূর দূর গ্রাম থেকে আসা অনেক মেয়ে সেখানে জমায়েত হয়েছিল। হঠাৎ সেখান থেকে মড়া-কান্নার মতো শোকার্ত রোদনধ্বনি উঠলো। এখানকার গ্রাম্যরীতি এইরকম যে গ্রামের মেয়ে বা কোনো প্রবাসিনী সখী, কুটুম্বিনী বা আত্মীয়ার সঙ্গে অনেকদিন পরে দেখা হলে উভয়ে উভয়ের গলা জড়িয়ে মড়াকান্না জুড়ে দেবে।

সংস্কৃতির ছবি যেমন, ছট পরবের বিস্তৃত বিবরণ এবং এই ছট্ পূজাকে কেন্দ্র করে খুপরিবাসী দরিদ্র অরণ্যবাসী মানুষদের যে আনন্দ ও উদ্দীপনা—সে ছবিও লেখক এঁকেছেন।

গাঙ্গোতা এবং দোষাদ জাতির মানুষ যে কতদূর অস্পৃশ্য—তার ছবিও আমরা পাই। ব্রাহ্মণকে রেঁধে খাওয়ানো পাপ, নীচ জাতি কখনোই সে কাজ করে পাপ অর্জন করবে না—সামাজিক এই বিশ্বাস গোটা উপন্যাসেই রয়েছে এবং এদের হাতের রান্না খেতে সত্যচরণের আপত্তি না থাকলেও এরা সেই পাপে জড়াতে চায় না—এই রীতিটিও উজ্জ্বলভাবে দেখানো হয়েছে।

এই অঞ্চলের আরও কিছু সামাজিক জীবনযাত্রার ছবি পাই। দরিদ্র গাঙ্গোতাদের বেশি সুদে টাকা ধার দেওয়া শোষণপটু মহাজনদের ছবি। রাসবিহারী সিং রাজপুতের

কথা এই প্রসঙ্গে মনে করা যেতে পারে। এমনকি দেবী সিং রাজপুতও যখন বেঁচেছিল—সেও শোষক মহাজন হিসেবে খাতক গরিবদের কাছ থেকে সুদ আদায় করার ব্যাপারে কম অত্যাচার করেনি।

দরিদ্র গাঙ্গোতা সম্প্রদায়ের মেয়েরা ভুট্টা ও কলাই কেটে নেবার পর ক্ষেতে গিয়ে পড়ে থাকা ভুট্টার দানা কুড়িয়ে এনে ছেলেদের খেতে দিত, মুসম্মত কুন্তাও এই দলের একজন। এমনকি, রাখালবাবুর স্ত্রীও এইভাবে গাঙ্গোতীন মেয়েদের মতোই ভিখারিনীতে পরিণত হতে চলেছে।

আঞ্চলিক উপন্যাসের একটা প্রধান শর্ত হলো যে—যে অঞ্চলের কথা, জীবন ও সমাজ নিয়ে উপন্যাসটি লেখা সেই অঞ্চলের একটা ভৌগোলিক চেহারা বা ধারণা পাঠকমনে অজ্ঞাতসারে অঙ্কিত হয়ে যাবে। 'আরণ্যকে' অবশ্যই তা হয়। বইটি পড়ার পর লবটুলিয়া, নাড়া-বইহার, বোমাইবুরুর জঙ্গল, সরস্বতী কুণ্ডী, ধনঝরি পাহাড়, মহালিখারূপ পর্বতমালা, অনার্যরাজ দোবরুপান্না বীরবর্দীর রাজ্য, মোহনপুরা ফরেস্ট—বেশ একটা ভৌগোলিক সীমা মনে গাঁথা হয়ে যায়। এই 'আরণ্যক' উপন্যাস সম্পূর্ণরূপে পূরণ করেছে। বোধহয় এই জন্যেই কিছু কিছু অধ্যাপক 'আরণ্যক'কে আঞ্চলিক উপন্যাস বলেছেন।

'আরণ্যকে' যে বিরাট অঞ্চল-প্রতিবেশের বর্ণনা করা হয়েছে, সেই অঞ্চলেরই প্রাকৃতিক বর্ণনা ঘুরে ফিরে এসেছে, কিন্তু যে জনসমাজের কথা বলা হয়েছে তার সামগ্রিক ও পূর্ণায়তন বিবরণ নেই। এই জনসমাজ যে প্রকৃতির অন্তর্গত, তেমন একটা ধারণা দেওয়া হয়েছে। তাই এসব দিক বিবেচনা করে 'আরণ্যকে'র আঞ্চলিক উপন্যাস হবার দাবী খারিজ হয়ে যায়।

তবে 'আরণ্যক' উপন্যাসে পটভূমিরই প্রাধান্য, এর চরিত্রগুলিও ভৌগোলিক পরিসীমার দ্বারা আবদ্ধ অঞ্চলেই লালিত-পালিত। অর্থনৈতিক জীবন সংগ্রামের কোনো পরিচয় এখানে নেই; সত্যচরণ জমি বিলি করে প্রজা বসিয়েছেন, অর্থনৈতিক জীবনের গোড়াপত্তন হলেও অর্থনৈতিক সঙ্কট বিষয়ে বিভূতিভূষণ মনোনিবেশ করেন নি। তিনি প্রকৃতি-প্রেমিক, প্রকৃতির রূপ ও রহস্যকেই দেখেছেন, মুগ্ধ হয়েছেন, সেই মুগ্ধতার কথা ব্যক্ত করেছেন। এই অরণ্য-অঞ্চলই প্রাধান্য লাভ করেছে, তার গাছপালা, আকাশ, সূর্য, নক্ষত্র, জ্যোৎস্না, নরনারী—সবই বর্ণনার বিষয় হয়েছে। তাই পটভূমি-প্রধান বলেই 'আরণ্যক'কে আঞ্চলিক উপন্যাস বলে কেউ কেউ মনে করেন। আসলে, 'আরণ্যক' উপন্যাস আঞ্চলিক সাহিত্যের কিছু লক্ষণ বহন করলেও একে পুরোপুরি আঞ্চলিক উপন্যাস বলা যায় না। কারণ অঞ্চলের স্বভাববৈশিষ্ট্য মানুষগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করেনি। এমনকি আরণ্যকের চরিত্রগুলি যেহেতু বাইরে থেকে আসা, তাই অঞ্চলের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তাদের চরিত্র গঠনে বিশেষ সহায়ক হয়নি এবং সেকারণে তারাশঙ্করের 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' কিম্বা মাণিকের 'পদ্মানদীর মাঝি'-র মতো 'আরণ্যক' আঞ্চলিক উপন্যাসের অভিধা পেতে পারে না।

অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন মানুষেরা তাকে কিছু বলতে সাহস করে না। তার সম্বন্ধে মুনেশ্বর সিং যথার্থই বলেছে, "...কত খুন করেছে জীবনে তার লেখাজোখা আছে হুজুর? ওর অসাধ্য কাজ নেই—খুন, ঘরজ্বালানি, মিথ্যে মকদ্দমা খাড়া করা, ও সবটাতেই মজবুত।"

রাসবিহারী সিং রোজ সকালে দেড় সের দুধ আর এক সের বিকানীর মিছরি খেয়ে জলযোগ করে। আস্তাবলে সাত-আটটি ঘোড়া। একটা ঘরে লাঠি, ঢাল, সড়কি, বর্শা, টাঙি, তলোয়ার রয়েছে—যেন একটি অস্ত্রাগার। শীঘ্র হাতি কেনার ইচ্ছাও তার আছে।

রাসবিহারী সিং-এর লাঠিয়াল দলটি মারামারিতে বিশেষ পটু। রাসবিহারী সিং সাংঘাতিক হিংস্র প্রকৃতির, যে তাকে যথেষ্ট মর্যাদা দেয় না, তাকে সে খুন করতেও দ্বিধা করে না। বৃদ্ধ মুনেশ্বর সিং বলে যে রাসবিহারী সিং জীবনে কত যে খুন করেছে—তার হিসেব লেখা-জোখা নেই। ওর অসাধ্য কোনো কাজ নেই। খুন, ঘরজ্বালানি, মিথ্যে মোকদ্দমা খাড়া করা—এই সব কাজেই রাসবিহারী সিং ওস্তাদ।

রাসবিহারী সিং অতিশয় সম্পন্ন ধনী মহাজন। সত্যচরণকে একবার রাসবিহারী সিং তার বাড়ির হোলির উৎসবে যোগ দিতে নিমন্ত্রণ করে। রাসবিহারী সিং খল, অসাধু এবং অতিশয় পাজী—এ কথা বলে সত্যচরণের কাছারির অনেকেই এই নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে সত্যচরণকে নিষেধ করে।

রাসবিহারী সিং দাম্ভিক ও রাশভারী লোক; নিজের সম্মান সম্পর্কে সে খুব সজাগ। পান থেকে চুন খসলেই তার মান চলে যায়, তাই তার সঙ্গে ব্যবহার করতে সকলেই খুব সতর্ক হয়। গাঙ্গোতা প্রজারা তো তার ভয়ে সর্বদা তটস্থ হয়ে থাকে।

রাসবিহারী সিং রাজপুতের ঋদ্ধির প্রাচুর্য আছে, কিন্তু রুচিবোধ নেই। অর্থ আছে, কিন্তু শালীনতা নেই। পরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দর্যবোধের কোনো বালাই নেই রাসবিহারীর।

কুন্তাকে ভুল বুঝিয়ে সে নিজের বাড়িতে এনে তুলেছিল কু-মতলবে, কিন্তু চরিত্রবতী কুন্তা রাসবিহারী সিং-এর বিশ্রী প্রস্তাব ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেছে, ছেলেমেয়েদের নিয়ে আসার সময় রাসবিহারীর মুখের ওপর বলে এসেছে যে, জান্ দেবে তবু ধর্ম দেবে না।

সুতরাং অরণ্যভূমিতে জমিদারের দোসর রূপে মহাজনদের উপস্থিতি মূলত ভীত গাঙ্গোতাদের শোষণের জন্যই। লেখক এই মহাজনদের শোষণের বাস্তব রূপ এঁকেছেন অরণ্য ও মানুষের মেলবন্ধনকে সার্বিক রূপ দেবার জন্য। কিন্তু এই শোষণের বিরুদ্ধে কোনো সংগ্রাম বা প্রতিকারের পদক্ষেপ লেখক অঙ্কন করেন নি। সেদিক থেকে মহাশ্বেতা দেবী 'অরণ্যের অধিকার' উপন্যাসে মুণ্ডাদের উপর শোষণের ছবি এবং তা থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য 'উলগুলান' এর স্বপ্ন বাস্তব রূপে রূপায়িত করেছেন।

॥ ষোলো ॥

আরণ্যক ঃ প্রকৃতি ও মানুষের ঐকতান

বিভূতিভূষণের শিল্পদৃষ্টিতে প্রকৃতি ও মানুষ একাকার। এদিক থেকে তিনি কালিদাস-এর স্বগোত্র। জীবন তাঁর কাছে 'একটা বিচিত্র অনন্ত রহস্য'— প্রকৃতি ও মানুষ তারই মধ্যে সাঙ্গীকৃত। অরণ্য ও ব্যক্তিজীবনের পটে তিনি প্রকৃতপক্ষে এই অনন্ত

জীবনজিজ্ঞাসাকেই অনুভব করতে চেয়েছেন। তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় উপেক্ষিত, অরণ্যসমাজের নরনারী সহজ, স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণচেতনায় তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল। যাবতীয় সহজ, অকৃত্রিম প্রাণাবেগই তাঁকে আকর্ষণ করে, আপন খেয়ালে নির্দিষ্ট সময়ে বেড়ে ওঠা, ঝরে যাওয়া প্রকৃতির এই সাবলীলতার সঙ্গে এই মানুষগুলির মিল লক্ষ করেন।

বিভূতিভূষণের প্রকৃতিমগ্ন মনোজগতে তুচ্ছ কিছুই নেই, সবই পূর্ণ, অপার কৌতূহলই তাকে অনুসন্ধিৎসু করে তোলে। তিনি নীলাকাশে, নক্ষত্রলোকে, প্লাবিত জ্যোৎস্নায়, ঘাসের ফুলে উত্তর খুঁজতে চান। অরণ্য দেবতারাই তাঁর পথ প্রদর্শক। নানা চরিত্রের মিছিলে তাঁরই বিভিন্ন মানসভঙ্গি অসীম জীবন রহস্যবোধে এসে মিলে যায়। "..... এই মুক্ত প্রান্তরের সীমাহীনতার মধ্যে কোন দেবতার স্বপ্ন যেন দেখিয়াছি—এই মেঘ, এই সন্ধ্যা, এই বন, কোলাহলরত শিয়ালের দল, সরস্বতী হ্রদের জলজ পুষ্প, মঞ্জী, রাজু পাঁড়ে, ভানুমতী, মহালিখারূপের পাহাড়, সেই দরিদ্র গোঁড়া পরিবার, আকাশ-ব্যোম সবই তাঁর সুমহতী কল্পনায় একদিন ছিল বীজরূপে নিহিত। .... এই বর্ষাসন্ধ্যা তাঁরই প্রকাশ, এই মুক্ত জীবনানন্দ তাঁরই বাণী, অন্তরে যে বাণী মানুষকে সচেতন করিয়া তোলে।"

বিভূতিভূষণ জানতেন, প্রকৃতি ও মানুষকে নিয়ে পূর্ণচেতনা। এই পূর্ণচেতনা লেখকের আস্তিক্যবাদী দর্শন প্রসূত। সেজন্য লেখক আরণ্যক-এ প্রকৃতি ও মানুষকে চিত্রিত করতে গিয়ে আদিম প্রকৃতির স্পন্দন যেমন উপলব্ধি করেছেন তেমনি প্রকৃতি সংলগ্ন মানুষকে, তাদের মানসিকতাকে অকৃত্রিম ও পূর্ণরূপেই উদ্ঘাটন করেছেন। প্রকৃতির অকৃত্রিম সারল্য ও স্বতঃস্ফূর্ততার মতোই চরিত্রগুলিও সহজ এবং সাবলীল রূপে অঙ্কিত হয়েছে। আধুনিক সভ্যতা ও নাগরিকতার স্পর্শে চরিত্রগুলির কোনো পরিবর্তন হয়নি।

বিভূতিভূষণ প্রকৃতিকে দেখেছেন শান্ত, নির্মোহ দৃষ্টিতে—সেই দৃষ্টিতে প্রকৃতির স্নিগ্ধ-কোমল এবং ভয়াল-রুক্ষ রূপ উদ্ঘাটিত হয়েছে। সত্যচরণ জঙ্গলে গিয়ে কর্মসূত্রে প্রকৃতিকে নতুন নতুন করে প্রতিনিয়ত উপলব্ধি করেছে। যেমন ঃ

(এক) "কত সন্ধ্যা আসিল অপূর্ব রক্তমেঘের মুকুট মাথায় দুপুরের খরতর রৌদ্র আসিল উন্মাদিনী ভৈরবীর বেশে, গভীর নিশীথে জ্যোৎস্নাবরণী সুরসুন্দরীর সাজে হিমস্নিগ্ধ বনকুসুমের সুবাস মাখিয়া, আকাশভরা তারার মালা গলায়—অন্ধকার রজনীতে কাল-পুরুষের আগুন খড়্গ হাতে দিগ্বিদিক ব্যাপিয়া বিরাট কালীমূর্তিতে।" —সত্যচরণের জঙ্গলের প্রতি মোহ এই পরিসরে ব্যক্ত হয়েছে।

(দুই) শীতের শেষে বসন্তের শুরুতে জঙ্গলের রূপ সত্যচরণকে অভিভূত করেছে, যা তিনি কখনো দেখেননি। তাঁর উপলব্ধি, "মাথার উপরের আকাশ কি ঘন নীল। আকাশে কোথাও একটা পাখী নাই, শূন্য-মাটিতে বন্য-প্রকৃতির বুকে কোথাও একটা মানুষ বা জীবজন্তু নাই—নিঃশব্দ, ভয়ানক নিরালা। চারিদিকে চাহিয়া প্রকৃতির এই বিজন রূপলীলার মধ্যে ডুবিয়া গেলাম—ভারতবর্ষে এমন জায়গা আছে জানিতাম না তো!"

(তিন) বাসন্তী পূর্ণিমার পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নারাতে জনহীন পাহাড় জঙ্গলের পথে

সত্যচরণ উপলব্ধি করেছে, "জ্যোৎস্না এবার ফুটফুট করিতেছে, গাছের ছায়া হ্রস্বতম হইয়া উঠিয়াছে, কি একটা বন্য ফুলের সুবাসে জ্যোৎস্নাশুভ্র প্রান্তর ভরপুর, অনেক দূরে পাহাড়ে সাঁওতালেরা জুম চাষের জন্য আগুন দিয়াছে, সে কি অভিনব দৃশ্য, মনে হইতেছে পাহাড়ে পাহাড়ে আলোর মালা কে যেন সাজাইয়া রাখিয়াছে।"

(চার) বোমাইবুরুর জঙ্গালে সত্যচরণের উপলব্ধি হয়েছে, 'এর জ্যোৎস্নাভরা নৈশ প্রকৃতি রূপকথার রাক্ষসী রাণীর মত।' কিম্বা মহালিখারূপের পাহাড় ও জঙ্গালের অপূর্ব রহস্যময়তা—এর জ্যোৎস্না, এর বন বনানী, এর নির্জনতা, এর নীরব রহস্য, এর মানুষজন, পাখির ডাক, বন্য ফুলশোভা সবই সত্যচরণের মনে এক গভীর শান্তি ও আনন্দ এনে দেয়। ঝর্ণার কলমর্মর ধ্বনির কাছে বসে সত্যচরণের মনে পড়ে বুদ্ধদেবের গৃহত্যাগ, বাল্মীকির রামায়ণ রচনার প্রেক্ষাপট এবং আরো অনেক কিছু।

এই আরণ্য প্রকৃতির মতোই অরণ্য লালিত বা বাইরে থেকে আসা অরণ্যের মানুষগুলি স্বতঃস্ফূর্ত, স্বাভাবিক ও অকৃত্রিম এবং প্রকৃতির মতোই অমলিন, অনভিজাত। অরণ্যের সারল্য যেমন চরিত্রগুলিতে রয়েছে তেমনি তাদের জীবনসংগ্রামে রয়েছে প্রকৃতির রুক্ষ কঠোর ভয়ালতা। তাই অরণ্য অঞ্চলে যেমন রয়েছে রাসবিহারী সিং, ছট্টু সিং, নন্দলাল ওঝার মতো পেশাদার মহাজন ও খল চরিত্রের মানুষ আবার অন্যদিকে রয়েছে সৌন্দর্যরসিক যুগলপ্রসাদ, দার্শনিক ও প্রকৃতিপ্রেমিক রাজু পাঁড়ে, নৃত্যশিল্পী কিশোর ধাতুরিয়া, আত্মভোলা কবি বেঙ্কটেশ্বর প্রসাদ, দূরাগত অন্নলোলুপ এক সাধারণ মানুষ গনোরী তেওয়ারী, সাচ্চা মানুষ গাঙ্গোতা গিরিধারীলাল, কাটুনি শ্রমিক নকছেদী, ভাগ্যবিড়ম্বিতা কুন্তা, প্রাণচাঞ্চল্য ও সারল্যের প্রতিমূর্তি মঞ্জী এবং রোমান্টিক প্রকৃতির বন্যবালা রাজকুমারী ভানুমতী।

E. M. Forster লিখেছেন, "They leave their characters rigidly alone, and allow the reader to see them without looking through the author's personality."—এই দৃষ্টিতে 'আরণ্যক' উপন্যাস বিচার করলে দেখা যায়, যুগলপ্রসাদ বা ধাওতাল সাহু, রাজু পাঁড়ে কিম্বা ধাতুরিয়া, নকছেদী, মঞ্জী প্রভৃতি চরিত্রগুলি উপস্থাপিত হয়েছে অরণ্যের বলিষ্ঠ পটভূমিকার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই।

লেখক অরণ্য পরিবেশে মানুষগুলির সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশাকে প্রকৃতির সঙ্গে সম্পৃক্ত করে দেখিয়েছেন, অজ্ঞতার কারণে কলেরায় মানুষ মরে, কিশোরী বধূ এরই মধ্যে গলিতান্ন রেখে দেয় আহার করবে বলে, এককালের প্রতাপান্বিত রাজা ও সাঁওতাল বিদ্রোহের নেতা দোবরু পান্না গরু চরায়, রাজকুমারী ভানুমতীর মধ্যে দেখা যায় একটি তুচ্ছ দর্পণের অভাব—এই তুচ্ছ ছবিগুলি অরণ্যের তুচ্ছতার মতো সাবলীল ও স্বতঃস্ফূর্ত।

আবার রাসবিহারী সিং-এর মতো অমার্জিত প্রাচুর্যময় মানুষেরা দম্ভ ও আভিজাত্য দেখায় নির্লজ্জভাবে, কুন্তার করুণ অসহায় জীবনে বেঁচে থাকে সম্মানবোধ, মুনেশ্বর সিং একটা লোহার কড়াই পেয়ে কত খুশি হয়, সামান্য ভাতের আশায় গাঙ্গোতারা কত দূর থেকে এসে ভিড় জমায়—এসব চিত্র তো বাস্তব এবং তা অরণ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত বলেই জীবন্ত।

প্রকৃতির নিজস্ব প্যাটার্নের মতোই আরণ্যক-এর চরিত্রগুলি একটি বিশেষ প্যাটার্নে

আবদ্ধ। যেমন, যুগলপ্রসাদ শুধুমাত্র প্রকৃতিপ্রেমিক ও সৌন্দর্যরসিক রূপেই চিত্রিত। শুধুমাত্র ভালো লাগার তাগিদেই গাছপ্রেমিক মানুষটি বিভিন্ন লতা, গুল্ম, পুষ্পে অরণ্যশোভা বাড়িয়ে তুলতেই আগ্রহী, সে জীবনের অন্য কোনো জটিলতায় প্রবেশ করেনি। তেমনি নৃত্যশিল্পী ধাতুরিয়া নির্লোভ একটি চরিত্র, নৃত্যই তার জীবন উপাসনা, আপনভোলা স্বভাবেই তাকে চেনা যায়। কবি দার্শনিক রাজু পাঁড়ের সামান্য চা-পানে আসক্তি থাকলেও সে তার স্ব-জগতে বাস করে, সরযুর সঙ্গে তার প্রথম আলাপের লজ্জারঞ্জিত স্মৃতি প্রাকৃতিক রূপেই উদ্ঘাটিত।

লেখক সত্যচরণের মনে ভানুমতীকে নিয়ে ঢেউ তোলেন নি, শুধুমাত্র তাঁর অন্তরের স্বপ্নের গৃহকোণকে কল্পনায় উদ্ভাসিত করেছেন—ভানুমতী যেন প্রকৃতির মতো স্থির প্রতিমা, সরল-সৌন্দর্যে অরণ্যলক্ষ্মী ভানুমতী। কুন্তা দুঃখিনী হলেও সহিষ্ণুতা, সম্মানবোধ ও আভিজাত্যে মহীয়সী প্রকৃতির মতোই সে সেবাপরায়ণা। আবার বাল্যের অভিমান ও চাঞ্চল্য নিয়ে মঞ্জী পলাতকা—প্রকৃতির চাঞ্চল্য মঞ্জীর মধ্যে রয়েছে।

কিম্বা জয়পাল কুমার যে শুধু কর্মশূন্য অবস্থায় স্তব্ধ হয়ে বসে থাকতে ভালোবাসে প্রকৃতির বুকে—একে দেখে সত্যচরণ ভেবেছে, "ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইয়া লাভ কি? কি সুন্দর ছায়া এই শ্যাম বংশী বটের, কেমন মন্থর যমুনাজল, অতীতের শত শতাব্দী পায়ে পায়ে পার হইয়া সময়ের উজানে চলিয়া যাওয়া কি আরামের।"

অরণ্য প্রকৃতির সারল্য ও প্রাণসত্তা নিয়ে রাজু পাঁড়ে তাই সত্যচরণকে বলে, "জীবনে সময়টাই বড় কম হুজুর। জঙ্গাল কাটতে গিয়ে কত কথা মনে পড়ে, বসে বসে ভাবি। এই যে বনজঙ্গাল দেখছেন, বড় ভাল জায়গা। ফুলের দল কত কাল থেকে ফুটছে আর পাখী ডাকছে, বাতাসের সঙ্গে মিলে দেবতারা পৃথিবীর মাটিতে পা দেন এখানে। টাকার লোভ, পাওনা-দেনার কাজ যেখানে চলে, সেখানকার বাতাস বিষিয়ে ওঠে।"

আরণ্যক শুধু প্রকৃতি ও মানবের ঐকতান নয়, এই মেলবন্ধন যে বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে মানুষকে হতাশা, যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেয়, হতাশা যন্ত্রণা ভুলতে প্রকৃতিকে নতুন করে উপলব্ধি করতে শেখায়, মানুষ প্রকৃতির সান্নিধ্যে থাকলে মানুষ যে প্রাকৃতিক (natural) হয়—সেই চিরন্তন সত্যটিকে উপলব্ধি করিয়েছেন। সভ্যতার রথ চলার পথে যেখানে প্রকৃতিকে নিরন্তর বিনাশ করে চলেছে এবং সেই সূত্রে মানুষও যেভাবে কৃত্রিম ও যান্ত্রিক হয়ে নিজেদের মনুষ্যত্বকে ভূলুণ্ঠিত করছে সেখানে প্রকৃতি ও মানুষের সাযুজ্যকে বেশি করে উপলব্ধি করার প্রয়োজনীয়তায় আরণ্যক এর লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির প্রাসঙ্গিকতা আজও রয়েছে।

॥ সতেরো ॥

আরণ্যক ঃ লোকসংস্কৃতি ও লোকায়ত জীবন

'আরণ্যক' অরণ্য-প্রকৃতি ও আরণ্য লালিত মানুষের ঐকতান বলেই সেই অঞ্চল ও অঞ্চলের মানুষের সাংস্কৃতিক দিক ও তাদের লৌকিক জীবনের রূপ বাস্তবসম্মত রূপে উপন্যাসে উদ্ঘাটিত হয়েছে। বিশেষ করে বিভূতিভূষণের অভিজ্ঞতা থেকে জাত

বিভিন্ন প্রসঙ্গ, আচার-আচরণ, সংস্কার বিশ্বাস, লোক-লৌকিকতা, আতিথেয়তা প্রভৃতি উপন্যাসে যেভাবে চিত্রিত হয়েছে, তাতে উপন্যাসটির শিল্পসিদ্ধি কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পেরেছে।

● **জঙ্গালমহলের মানুষের আতিথেয়তা ঃ**

(অ) সুংঠিয়া গ্রামে মৈথিল ব্রাহ্মণ নন্দলালের বাড়িতে সত্যচরণের আতিথেয়তার স্বরূপ—

(ক) সত্যচরণ নন্দলালের বাড়িতে ঢোকা মাত্র দু-বার বন্দুকের আওয়াজ হল।

(খ) নন্দলাল সহাস্যমুখে একটা বড় ঘরের দাওয়ায় তাঁকে বসাল। চেয়ারটি শিশুকাঠের তৈরি এবং দেশীয় মিস্ত্রির দ্বারা প্রস্তুত।

(গ) দশ-এগারো বছরের একটি মেয়ে এসে সত্যচরণের কাছে একটি থালা ধরল—থালায় গোটাকতক আস্ত পান, আস্ত সুপারি, একটি মধুপর্কের মতো ছোট বাটিতে সামান্য আতর, কয়েকটি শুকনো খেজুর। মেয়েটি কোনো কথা না বলে থালাটি অতিথির কাছে রেখে চলে গেল।

(ঘ) যাওয়ার সময় একটি প্রকাণ্ড পিড়ির আসন পাতা হল, পূজার নৈবেদ্য সাজাবার উপযোগী একটি পিতলের থালা আনা হল। অন্ন ব্যঞ্জনের তালিকায় ছিল হাতির কানের মতো বড় বড় পুরী, বাথুয়া শাকের ভাজা, পাকা শশার রায়তা, কাঁচা তেঁতুলের ঝোল, মহিষ দুধের দই ও পেঁড়া।

(ঙ) সত্যচরণকে দেখবার জন্য লোকে লোকারণ্য।

(চ) খাওয়ার পর নন্দলাল থলি ভর্তি টাকা দিল 'হুজুরের নজর' হিসাবে।

(আ) ভানুমতীর আতিথেয়তা ঃ ঘরটি অতিথিকে অভ্যর্থনার জন্য চমৎকার ভাবে নিকোনো। দেওয়ালে গিরিমাটির রং, পদ্ম গাছ, ময়ূর আঁকা, শাল কাঠের খুঁটির গায়ে লতা ও ফুল জড়ানো। পিতলের সরাতে ফলমূল-কাটা ও একবাটি গরম দুধ, কাঁচা শালপাতায় গোটা পান, গোটা সুপারি ও সঙ্গে পানমশলা। সত্যচরণের সামনে বসে খাওয়ানো ও এই নিঃসংকোচ বন্ধুত্ব দেখে সত্যচরণের মন্তব্য, 'কোনো বাঙালী কুমারী অনাত্মীয় ষোড়শী এমন ব্যবহার করিত।'

● **রীতি ও প্রথা ঃ**

ক) জঙ্গালে শীতকালে আগুন পোহানো এবং সেখানে অতিথি এলে আগুন পোহাতে আহ্বান করা। (নকছেদী সত্যচরণকে আহ্বান করেছিল)

খ) মান্য লোকের সঙ্গে কথা বলতে গেলে সম্ভ্রমে 'হুজুর' বলা।

গ) "গ্রামের মেয়ে বা কোনও প্রবাসিনী সখী, কুটুম্বিনী বা আত্মীয়ার সঙ্গে অনেক দিন পরে দেখা হইলেই উভয়ে উভয়ের গলা জড়াইয়া মড়া-কান্না জুড়িয়া দিবে।"

ঘ) প্রত্যেক বস্তিতে একটা উঁচু হনুমানজীর পতাকা থাকে এবং এই পতাকার পূজা করা হয়।

● **বিশ্বাস ও সংস্কার ঃ**

ক) বোমাইবুরুর জঙ্গালে জীনপরী বা ডামাবানু নাচানাচি করে এবং তারা মানুষকে মেরে ফেলে।

খ) জঙ্গালমহালে বন্য মহিষের দেবতা টাঁড়বারো। এই দেবতা বুনো মহিষের কোনো ক্ষতি হতে দেয় না। দশরথ সিং ঝাঙাওয়ালা এই দেবতাকে প্রত্যক্ষ করেছে বলে জানিয়েছে।

গ) উদ্ভুক্কু সাপ, জীবন্ত পাথর ও আঁতুড়ে ছেলের হেঁটে বেড়াবার কথা গণু মাহাতোর বাস্তব অভিজ্ঞতাজাত।

● **পণপ্রথা ঃ**

জঙ্গালমহালে থাকার সময়ে দক্ষিণ বিহারে এক অজ গ্রামে বসবাসকারী বাঙালি পরিবারের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। এই পরিবারের কর্তা হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারি করে চাষবাসের জমিজমা কিনে তাতে চাষবাস করার সময়ে একটি ছেলে ও তিনটি আইবুড় মেয়েকে রেখে মারা যায়। বড় মেয়েটির বয়স বাইশ, দেখতে সুশ্রী। কিন্তু এক বর্ণও বাংলা জানে না, আকৃতি-প্রকৃতিতে খাঁটি দেহাতী বিহারী মেয়ে। গায়ে তার বেশ শক্তি—গম পেষাই করা উদখুলে ছাতু ভাঙা, মোট বহন করা, গরু মহিষ চরানো কোনো কাজই তার কাছে ভার নয়। এ ধরনের মেয়েরও বিয়ে হচ্ছে না, তার কারণ পণপ্রথা। গরিব বাড়িতে এত পণ দিয়ে বিয়ে সম্ভব নয়।

এমনকি মেয়ের দাদা একজন পাত্রকেই তিনটি বোনকে পাত্রস্থ করতে চেয়েছিল এবং তিন বোনের তাতে অমতও ছিল না। কিন্তু তাতেও ঐ মেয়েদের বিয়ে হয়নি পণের কারণে। তাই সত্যচরণের আক্ষেপ—"হায় হতভাগিনী বাঙালী কুমারী! এত বৎসর পরেও সে নিশ্চয় আজও গাঙ্গোতীন সাজিয়া দাদার সংসারে যব কুটিতেছে, কলাইয়ের বোঝা মাথায় করিয়া মাঠ হইতে আনিতেছে, কে আর দরিদ্রা দেহাতী বয়স্থা মেয়েকে বিবাহ করিয়া পাল্কিতে তুলিয়া ঘরে লইয়া গিয়াছে, মঙ্গলশঙ্খ ও উলুধ্বনির মধ্যে!"

● **উৎসব ঃ**

পুণ্যাহ ঃ জমিদারিতে আষাঢ় মাসের প্রথমে পুণ্যাহ উৎসব হয়ে থাকে। এই উৎসবে জঙ্গালের লোকেদের নিমন্ত্রণ করে খাওয়ানো হয়। সেই ভোজের খাদ্য ছিল — চীনা ঘাসের দানা, টক দই, ভেলি গুড় ও লাড্ডু।

● **হোলির মেলা ঃ**

জঙ্গালমহালে কড়ারী তিনটাঙায় অনুষ্ঠিত হোলির মেলা উল্লেখযোগ্য। ছোট্ট একটি গ্রামের মাঠে, পাহাড়ের ঢালুতে চারদিকে শাল-পলাশের বনের মধ্যে এই মেলা বসে। এই মেলায় মহিষারডি, কড়ারী-তিনটাঙা, লছমনিয়াটোলা, মহালিখারূপ প্রভৃতি স্থান থেকে মূলত মেয়েরা আসে। তরুণী বন্য মেয়েরা আসে চুলে পিয়াল ফুল অথবা রাঙা ধাতুপ ফুল গুঁজে, কারো কারো মাথার বাঁকা খোঁপায় কাঠের চিরুনি আটকানো। মেয়েরা পুঁতির মালা, সাবানের বাক্স, বাঁশি, আয়না, সেন্ট কেনে, পুরুষেরা এক পয়সায় দশটা কালী সিগারেট কেনে, ছেলেমেয়েরা তিলুয়া বেউড়ি, লাড্ডু, তেলেভাজা কেনে। প্রবীণ লোকেরা প্রাচীন বই যেমন গোলেবকাউলী, লায়লা মজনু প্রভৃতি কেনে।

এই মেলায় কোনো বউর সঙ্গে যদি তার বাপের বাড়ির কোনো সখী বা আত্মীয়দের দেখা হয় তখন তারা গলা জড়িয়ে মড়াকান্না জুড়ে দেয়—এটাই সেখানকার রীতি।

মেলায় দোকানীদের ব্যবসায়ী বুদ্ধি যথেষ্ট। মেলার স্থান থেকে কিছু দূরে শালবনের মধ্যে কিছু লোক রান্না করে খাওয়া-দাওয়া করছে। অন্যদিকে তরীতরকারী, লাল পিঁপড়ের ডিম বিক্রি হচ্ছে।

● ফসল তোলার পর আনন্দ উৎসব ঃ

ফুলকিয়া বইহারে সরিষা ফসল তোলার পর মানুষের আনন্দ উৎসবের বর্ণনা দিয়েছেন লেখক।

সরিষার গাছ শুকিয়ে মাড়িয়ে বীজ বের করার সঙ্গে সঙ্গে কোথা থেকে দলে দলে নানা শ্রেণির লোক এসে জুটতে লাগল। পূর্ণিয়া, মুঙ্গের, ছাপরা প্রভৃতি স্থান থেকে মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীরা দাঁড়িপাল্লা ও বস্তা নিয়ে এল মাল কিনতে। তাদের সঙ্গে কুলির ও গাড়োয়ানের কাজ করতে এল একদল লোক। হালুইকররা এসে অস্থায়ী কাশের ঘর তুলে মিঠাইয়ের দোকান খুলে পুরী, কচুরি, লাড্ডু, কালাকাঁদ প্রভৃতি বিক্রয় করতে লাগল। ফেরিওয়ালা নানা ধরনের সস্তা ও খেলো মনোহারী জিনিস, কাচের বাসন, পুতুল, সিগারেট, ছিটের কাপড়, সাবান প্রভৃতি নিয়ে বসল। তাছাড়া রং-তামাশা দেখিয়ে অনেকে পয়সা উপার্জন করত। নাচ দেখিয়ে, রাম-সীতা সেজে পয়সা আয় করত।

এভাবে চারদিকে ছেলেমেয়েদের হাসি, কলরব, ঝুমঝুমির আওয়াজ, নাচিয়েদের ঘুঙুরের ধ্বনি প্রভৃতির মাধ্যমে ফুলকিয়া বইহারের চেহারাটা বদলে গেল।

● ঝুলন উৎসব ঃ

রাজা দোবরু পান্নাদের ঝুলন উৎসব জঙ্গল মহালে বিশেষ উৎসব। অনেক দূর থেকে আত্মীয়-স্বজনেরা আসে ঝুলনে নাচতে। আড়াই মণ চাল একদিনে রান্না হয়। রাজবাড়িতে নবাগত কুটুম্বিনী ও রাজকন্যার সহচরীদের নিয়ে আগে থেকেই নাচ-গানের মহলা হয়। উৎসবে মাদল বাজে। অতিথি অভ্যাগতদের খাওয়ানো হয়। পূর্ণিমার জ্যোৎস্না প্লাবিত বনস্থলীতে একটি গাছকে ঘিরে প্রায় ত্রিশটি তরুণী ঘুরে ঘুরে নাচতে থাকে, একদল যুবক মাদল বাজায়, মেয়েদের খোঁপায় ফুলের মালা, গায়ে ফুলের গহনা। অনেক রাত পর্যন্ত নাচ-গান চলে।

লোকায়ত জীবন ঃ

অরণ্যের মধ্যে ও বাইরে থেকে আসা বেশিরভাগ মানুষই হত দরিদ্র। তাদের নির্দিষ্ট ঘর নেই, শীতের পোষাক নেই, জীবন ধারণের মানও সেরকম। কোনোরকম একটু ঘাটো পেলেই তারা নিশ্চিন্ত, থাকেও যাযাবরের মতো। নির্দিষ্ট কোনো বসতি কাটুনি মজুরদের নেই, তারা যাযাবর। জীবিকার প্রয়োজনে আসে আবার চলে যায়। অরণ্যে যারা বসবাস করে তাদের প্রধান জীবিকা কৃষিকাজ ও পশুপালন। এজন্য তাদের কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। শ্রম করতে তাদের আলস্য নেই, তারা ধর্মভীরু। দুঃখ-দারিদ্র্য তাদের সহজ সাবলীল জীবনছন্দকে বিনষ্ট করতে পারেনি।

বিভূতিভূষণ নিপুণ শিল্পীর মতো প্রকৃতি ও প্রকৃতি লালিত মানুষের স্বরূপ চিত্রিত করতে গিয়ে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের আঞ্চলিক রীতি, সংস্কৃতি, বিশ্বাস ও লোকায়ত জীবনকে উদ্ঘাটিত করে চরিত্রগুলিকে বাস্তব রূপ দিতে পেরেছেন।

অঞ্চলে থাকার অভিজ্ঞতা থেকে সৃষ্ট। এমনকি সত্যচরণ স্বীকার করেছেন গনুর মিথ্যা বলার মতো কল্পনাশক্তি ছিল না।

অলৌকিক স্বপ্নের জগৎ তৈরি করার জন্যে বিভূতিভূষণ কল্পনাসমৃদ্ধ মোহিনী ভাষা ব্যবহার করেছেন, সেই ভাষার মায়ায় বর্ণিতব্য যা-কিছু অসম্ভব ও অবাস্তব বলে বোধ হয় না, বুদ্ধি দিয়ে, যুক্তি দিয়ে বিচার করতে মন চায় না। ধীরে ধীরে লেখক অলৌকিক স্বপ্নময় পরিবেশে পাঠককে যা শোনান—তা বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে। ডামাবাণু বা টাঁড়বারোর অস্তিত্ব বিশ্বাস করবার কোনো বাস্তব কারণ নেই, কিন্তু অবিশ্বাস করতেও মন চায় না। এটাই হল পাশ্চাত্যের ম্যাজিক রিয়ালিজম বা যাদু বাস্তবতা। আদিম অরণ্যবাসীর গল্পে তাদের আদিম বিশ্বাস এবং চিরপ্রচলিত সংস্কারের ধারার পরিচয় না দিলে ঔপন্যাসিকের সততা রক্ষিত হয় না। এদিক থেকে বিভূতিভূষণ 'আরণ্যকে' অলৌকিকতার একটু ছোঁয়া রেখেছেন এবং তা সুন্দর ও সঙ্গত হয়েছে। আসলে সত্যচরণ প্রকৃতির সান্নিধ্যে এসে প্রকৃতির মধ্যে কান পেতে শুনেছেন। তাই সম্ভাব্যতার ভিত্তিতে অলৌকিক বর্ণনাও লৌকিকের মর্যাদা পেয়ে যায়।

॥ উনিশ ॥

বিভূতিভূষণের মানবপ্রীতি ও জীবনদৃষ্টির গভীরতা

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'আরণ্যক'-এর আলোচনা প্রসঙ্গে জানিয়েছেন, "প্রকৃতির সহিত মানবমনের এমন অন্তরঙ্গ সম্পর্কের কাহিনী বাঙলা উপন্যাসে নাই-ই, ইউরোপীয় উপন্যাসেও এরূপ দৃষ্টান্ত সুলভ নহে।" আসলে বিভূতিভূষণ তাঁর সাহিত্যে প্রকৃতি ও মানুষকে এক নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন। তাঁর এই শিল্পদৃষ্টি স্বকীয় এবং স্বাধীন মর্যাদাসম্পন্ন। প্রকৃতির সংসারে লালিত বিভিন্ন ধরনের মানুষেরা এক নতুন স্বতন্ত্র মর্যাদায় ভূষিত হয়েছে।

কথাশিল্পী বিভূতিভূষণ তাঁর গল্পে ও উপন্যাসে মানুষ এবং প্রকৃতিকে অভিনব জগতে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। প্রকৃতির কোলে বৃক্ষলতা, পাহাড়, অরণ্য, নদী প্রান্তর, তৃণগুল্ম-বনস্পতি, মানুষজন—একই সুরের তারে বাঁধা। প্রকৃতির বহির্লোক এবং অন্তর্লোক যেমন তাঁর সাহিত্যে রূপায়িত হয়েছে, তেমনি সরল সাদা-সিধে মানুষগুলি তাদের হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ নিয়ে তাঁর সাহিত্যলোকে স্থান পেয়েছে। তাই বিভূতিভূষণের সাহিত্যকে বুঝতে গেলে শিল্পীর দৃষ্টিভঙ্গির সন্ধান করতে হবে।

তিনি একদিকে প্রকৃতির সাধক, প্রকৃতি সর্বত্রই তাঁর সাহিত্যে এক বিশিষ্ট ভূমিকা নিয়ে রূপায়িত হয়েছে, অন্যদিকে রয়েছে প্রকৃতিলগ্ন মানুষ। তাই বিভূতিভূষণের সৃষ্ট মানুষকে বুঝতে হলে সেই মানুষটিকে প্রকৃতির পটভূমিতে নিয়ে এসে বিচার করতে হবে। বিভূতিভূষণ সহজ প্রকৃতির মধ্যে জীবনের সহজ আনন্দের সম্প্রীতি খুঁজে পান আর এই সাবলীল, স্বতোৎসারিত আনন্দ তাঁকে পৌঁছে দেয় গভীর রহস্যের অন্তর্দেশে।

'বন্যেরা বনে সুন্দর'—এ কথাটার আর এক জ্বলন্ত উদাহরণ 'আরণ্যকে'র মানুষেরা। নেটো বালক ধাতুরিয়া, রাজু পাঁড়ে, মঞ্চী, গনু মাহাতো, যুগলপ্রসাদ, এমনকি বহিরাগত বাঈজী কন্যা মুসম্মত কুন্তা প্রভৃতি মানুষরা অরণ্যীভূত হয়ে গেছে। আজমাবাদ,

লবটুলিয়া, নাড়া-বইহারের বনের সঙ্গে একীভূত হয়ে উঠেছে এই মানুষেরা। অরণ্যের পরিবেশেই এদের মানবিক সত্তার পরিচয় বিকশিত হয়েছে।

বিভূতিভূষণের যে জীবনদৃষ্টি ধরা পড়েছে—তাতে মানুষের বাস্তব জীবনের দুঃখ-দুর্দশা, দ্বিধা দ্বন্দ্ব, সংঘাত-বিপর্যয় বড় হয়ে ওঠেনি। জীবন বিপর্যয়ের ঝড় ও ঝঞ্ঝার কথা যতটুকু না বললে নয়, সেটুকুই তিনি শুধু বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এখানকার মানুষজনের অভ্যন্তরীণ সত্যস্বরূপের উদ্ঘাটন করার চেষ্টায় ব্রতী হয়েছেন। মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির বন্ধন যে নিবিড় এবং প্রায় অবিচ্ছিন্ন—একথা তিনি আরণ্যকে বার বার ঘোষণা করেছেন। টাঁড়বারো যেমন বন্য মহিষের দেবতা, মানুষের ফাঁদ থেকে ইনি মহিষদের যেমন রক্ষা করেন, তেমনি বনলক্ষ্মী ও অরণ্যের এই মানুষগুলির অভিভাবকত্ব করেন, তাদের দুঃখ-সুখের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেন, নিবিড় আত্মিক বন্ধনে প্রকৃতির সঙ্গে তার অঞ্চলাশ্রিত মানুষগুলি জড়িয়ে থাকে। তাই 'আরণ্যকে'র মানুষগুলিকে প্রকৃতিলোক থেকে আলাদা করে উপস্থিত করা যায় না।

জীবনের অন্তর্গূঢ় জটিলতত্ত্বের দিকে বিভূতিভূষণের দৃষ্টি নেই; 'আরণ্যকে' তিনি শুধু ধাত্রীরূপা অরণ্যপ্রকৃতির কোলে লালিত কিছু মানুষের জীবনের ছবি এঁকেছেন, তাদের সুখের উন্মাদনা বা দুঃখের হাহাকারের প্রতি তিনি দৃষ্টি দেননি। প্রকৃতির প্রতিবেশে জীবন দেবতার আদি অকৃত্রিম রূপ দেখে অভিভূত হয়েছেন। মানুষকে ভালবেসেই মানুষের জীবন সম্পর্কে তাঁর জিজ্ঞাসা যেন তৃপ্ত হয়েছে।

প্রকৃতির কোমলতা ও রুক্ষতার মতোই অরণ্যের চরিত্রগুলি তাদের স্বভাব কোমলতা ও রূঢ়তা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। তাই একদিকে কবি রাজু পাঁড়ে, সৌন্দর্যরসিক যুগলপ্রসাদ, নৃত্যশিল্পী উদাসীন ধাতুরিয়া, চিরন্তনী কিশোরী মঞ্চী, সহিষ্ণু কুন্তা, আরণ্যসত্তার মূর্তিমতী প্রতিনিধি ভানুমতী আবার অন্যদিকে শোষক মহাজন রাসবিহারী সিং, নন্দলাল ওঝা-র মতো চরিত্র অঙ্কন করেছেন। চরিত্রগুলি অরণ্য প্রকৃতির সঙ্গে মানানসই। আবার শিল্পীর নির্মোহ ও শান্ত দৃষ্টিভঙ্গির জন্য রাজপুত গাঙ্গোতাদের হাঙ্গামা, জমিবিলির দুরন্ত বিপত্তি, কুন্তার নিগ্রহ, মঞ্চীর পলায়ন, ধ্রুবা ও জবার শ্রম-কর্কশ জীবনযাত্রা—কোনোটাই ভীষণ রূপে উপন্যাসে বর্ণিত হয়নি।

'আরণ্যকে' যে চরিত্র এসেছে—তাদের সকলকেই সত্যচরণ ভালবেসেছেন। সত্যচরণের ব-কলমেই আমরা বিভূতিভূষণের আত্মস্বরূপের দেখা পাই; তাই সত্যচরণের যে মানব প্রীতির পরিচয় উপন্যাসে রূপলাভ করেছে, বলা নিষ্প্রয়োজন তা বিভূতিভূষণেরই।

বিভূতিভূষণ হচ্ছেন মানবপ্রেমিক কথাসাহিত্যিক। তিনি যেমন প্রকৃতির পূজারী তেমনই মানবতার পুরোহিত। তাই অজস্র মানুষের মেলার মধ্যে নির্লোভ, নিষ্ঠাবান, সত্যবাদী, উদার মনোভাবাপন্ন আত্মমর্যাদাযুক্ত লোকগুলিকে অসাধারণ সহৃদয়তার সঙ্গে তিনি অঙ্কিত করেছেন। একনিষ্ঠ সতীত্বের যে উদাহরণ তিনি মুসম্মত কুন্তার মধ্যে স্থাপিত করেছেন—তার তুলনা মেলা ভার।

বারো-তেরো বছরের নাটুয়া বালক ধাতুরিয়াকে দেখে লেখকের অন্তর স্নেহে মমতায় পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। নিজের বলতে ধাতুরিয়ার কেউ ছিল না, একটা নাচের দলের সঙ্গে সে ঘুরে বেড়ায়, খেতে পায় না, শুধু চীনা-ঘাসের দানা আর নুন খেয়ে

থাকে। সত্যচরণ তাকে কাছারিতে চাকরি দিতে চেয়েছিলেন। সুশ্রী কালো লাবণ্যভরা চেহারার ওই বালকটির প্রতি লেখকের মমতা গভীরভাবেই প্রকাশিত হয়েছে।

শুধু মানুষজনকে ভালবাসার মধ্যেই মানবপ্রীতি প্রকাশিত হয়েছে। গরীব দুঃখী মানুষ দেখলেই সত্যচরণের মন কাতর হয়েছে, দুঃখীর সমবেদনায় ব্যথিত বোধ করেছেন।

বন্ধুহীন বিদেশে দুটি নাবালক ছেলে নিয়ে সহায়-সম্পদশূন্য বিধবা মহিলাটির দশা ভেবে সত্যচরণ কাতর হয়ে পড়লেন। স্টেট থেকে তিনি একশো টাকা সাহায্যের ব্যবস্থা করে রাখালবাবুর শ্রাদ্ধ শেষ করালেন। স্টেট থেকে ঐ দুঃস্থ পরিবারের জন্যে মাসে মাসে দশ টাকা করে সাহায্যের ব্যবস্থা করে দিলেন। দুঃস্থ মানুষের প্রতি বিভূতিভূষণের মমতা যে কত অপরিসীম—তা বোঝা যায় এই ঘটনা থেকে।

শুধু এই ঘটনা নয়, 'আরণ্যক' উপন্যাসের সব বিপর্যস্ত চরিত্র সম্পর্কেই লেখকের অগাধ ভালবাসার পরিচয় পাওয়া যায়।

আষাঢ়ে পুণ্যাহ উৎসবে দোষাদদের মেয়েদের খাওয়ানোর ব্যাপারে যে সামান্য অবহেলা ও অনাদর হচ্ছে—তা দেখে সত্যচরণ ব্যথিত হয়েছেন।

লাক্ষা চাষের জন্যে আসা দিগ্‌ভ্রান্ত পথভ্রষ্ট অপরিচিত তৃষ্ণার্ত মুমূর্ষু মানুষটিকে কাছারিতে আনিয়ে গরম জলের সঙ্গে লেবুর রস খাইয়ে তাকে জীবনদান করার দুর্লভ মাহাত্ম্যের নজিরও আমরা সত্যচরণের মধ্যে দেখি।

বিভূতিভূষণের জীবনদৃষ্টি স্বচ্ছ, কোথাও জটিল রূপ ধারণ করেনি। সরল জীবন সাধনাই তাঁর আকাঙ্ক্ষিত, যন্ত্রণাজর্জর জীবনচর্যার প্রতি তাঁর গভীর অনীহা ছিল। দ্বন্দ্ব বা সংগ্রামের মাধ্যমে কিংবা জটিল জীবনাবর্ত থেকে আর্থিক সুবিধা আহরণ করার মানসিকতা তাঁর ছিল না। যাকে লোকে জীবনের উন্নতি বলে থাকে, বিভূতিভূষণ সেই তথাকথিত উন্নতিকে কখনও কাম্য বলে মনে করেন নি। তাই তাঁর চিত্রিত ভানুমতী সরল সৌন্দর্যে অরণ্য লক্ষ্মী, দুঃখিনী কুন্তা মহিয়সী চরিত্র।

বিভূতিভূষণের জীবনদৃষ্টি তাই প্রকৃতির প্রতিবেশে স্নিগ্ধ সরল জীবনচর্যার মধ্যে সমাহিত—যেখানে কোনো কৃত্রিমতা বা সুবিধাবাদী যন্ত্রণাজর্জর মানসিকতার আবর্তের সম্ভাবনা পর্যন্ত থাকবে না। গভীর মানবপ্রীতি ও সৌন্দর্যচেতনার রোমান্টিক ধারণা নিয়েই লেখক প্রকৃতি ও প্রকৃতি লালিত মানুষের ছবি অঙ্কন করেছেন।

॥ কুড়ি ॥

আরণ্যক ঃ ভাষাশৈলীর মাধুর্য

ভাবের বাহন হল ভাষা। ভাব ও ভাষার সমন্বয়ই শিল্পের সার্থকতার অন্যতম দিক। বিভূতিভূষণ তাঁর শান্ত, নির্মোহ ও ইতিবাচক দৃষ্টি দিয়ে অরণ্য প্রকৃতি ও অরণ্যলালিত মানুষগুলিকে চিত্রিত করেছেন, যা অনেকটাই তাঁর অভিজ্ঞতাজাত। এই দৃষ্টিই সৃষ্টির মূলে। ফলে আরণ্যক-এর ভাষাশৈলীর যে মাধুর্য—তার উৎসে রয়েছে লেখকের নিরাসক্ত সার্থক এক দৃষ্টিভঙ্গি। লেখক প্রকৃতিকে যেমন দেখেছেন ঠিক তেমনিভাবেই বর্ণনা করেছেন, কোনো মোহের জাল বিস্তার করেননি। বর্ণনীয় বিষয়বস্তুর টানে যখন যে ভাষা স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর কলম থেকে বেরিয়েছে তাই তিনি দ্বিধাহীন ভাবে

বংশধরগণের রক্তে আজও আনন্দ ও উৎসাহের বাণী পাঠাইয়া দিতেছে।" (ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ/৩)

রোমান্টিক বর্ণনার আবেশে সমৃদ্ধ ভাষা ঃ "নাঢ়া বইহারের কি আজমাবাদের মুক্ত প্রান্তরে কত গোধূলিবেলায় রক্তমেঘস্তূপের কত দিগন্তহারা জনহীন জ্যোৎস্নালোকিত প্রান্তরের দিকে চাহিয়া মনে হইত তিনিই প্রেম ও রোমান্স, কবিতা ও সৌন্দর্য, শিল্প ও ভাবুকতা—তিনি প্রাণ দিয়া ভালবাসেন, সুকুমার কলাবৃত্তি দিয়া সৃষ্টি করেন, নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিলাইয়া দিয়া থাকেন নি ঃ শেষে প্রিয়জনের প্রীতির জন্য—আবার বিরাট বৈজ্ঞানিকের শক্তি ও দৃষ্টি দিয়া গ্রহ-নক্ষত্র-নীহারিকার সৃষ্টি করেন।" (পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ/৩)

মিষ্টিক অনুভূতির ভাষা ঃ "এই নিস্তব্ধ নির্জন রাত্রে দেবতারা নক্ষত্ররাজির মধ্যে সৃষ্টির কল্পনায় বিভোর, যে কল্পনায় দূর ভবিষ্যতে নব নব বিশ্বের আবির্ভাব, নব নব সৌন্দর্যের জন্ম, নানা নব প্রাণের বিকাশ বীজরূপে নিহিত। ... জন্ম জন্মান্তরের পথ বাহিয়া দূর যাত্রার আশায় যার ক্ষুদ্র তুছ বর্তমানের দুঃখশোক বিন্দুবৎ মিলাইয়া গিয়াছে, সে-ই তাঁদের সে রহস্যরূপ দেখিতে পায়।" (দ্বাদশ পরিচ্ছেদ/১)

ক্লাসিক রীতির বর্ণনাভঙ্গি ঃ "দুপুরে বাহিরে দাঁড়াইয়া তাম্রাভ অগ্নিবর্ষী আকাশ ও অর্ধশুষ্ক বনঝাউ ও লম্বা ঘাসের বন দেখিতে ভয় করে—চারিধার যেন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে, মাঝে মাঝে আগুনের হলকার মত তপ্ত বাতাস সর্বাঙ্গ ঝল্‌সাইয়া বহিতেছে — সূর্যের এ রূপ, দ্বিপ্রহরের রৌদ্রের এ ভয়ানক রুদ্র রূপ কখনও দেখি নাই, কল্পনাও করি নাই।" (তৃতীয় পরিচ্ছেদ/৩)

কবিতার আবহ ও ছন্দস্পন্দ যুক্ত ভাষা ঃ "দেড় হাজার বিঘা ব্যাপী একটা বিরাট প্রান্তর দূর দিগ্বলয়সীমা পর্যন্ত হলুদরঙের গালিচায় ঢাকা—এর মধ্যে ছেদ নাই, বিরাম নাই—উপরে নীল আকাশ, ইন্দ্রনীল মণির মত নীল—তার তলায় হলুদ—হলুদ রঙের ধরণী, যতদূর দৃষ্টি যায়।" (নবম পরিচ্ছেদ/৪)

বর্ণনায় মাধুর্যে, শব্দচয়নের মুন্সিয়ানায়, আবেগ ও আবহ সৃষ্টিতে, পরিবেশ অনুযায়ী ভাষা ব্যবহারে এবং বিভিন্ন চরিত্রোপযোগী ভাষা প্রয়োগে বিভূতিভূষণের আরণ্যক উল্লেখযোগ্য হয়ে রয়েছে।

॥ একুশ ॥

আরণ্যক ঃ চরিত্রচিত্রশালা

● সত্যচরণ ঃ উপন্যাসের কথক

'আরণ্যক' নানা ধরনের চরিত্রের চিত্রশালা। 'আরণ্যক' উপন্যাসের সেই চিত্রশালার প্রধান কারিগর সত্যচরণ। লেখকের বকলমে তিনি উত্তম পুরুষের ভূমিকায় কাহিনি বর্ণনা করেছেন। জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সত্যচরণ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, "তাকে আরণ্যক-এর নায়ক বললে মস্ত বড় ভুল করা হবে। সে বহিরাগত মানুষ—অরণ্যের সঙ্গে এবং অরণ্যচারী নরনারীদের সঙ্গে তার সত্যকার নাড়ীর যোগ নেই। প্রকৃতির এই আরণ্য রঙ্গমঞ্চে প্রতিদিন যে রহস্যনাট্যের অভিনয় হয় তার বর্ণাঢ্য

পট-পরিবর্তনের এবং বৈচিত্র্যময় ঘটনা সংস্থানের সে নিষ্ক্রিয় দর্শকমাত্র।" কারণ এই উপন্যাসে প্রকৃতি যেহেতু নায়িকা তাই নায়ক থাকার কথা নয়।

সত্যচরণ শিক্ষিত যুবক; কলকাতায় যতদিন মেসে ছিলেন, ততদিন তাঁর আড্ডাবাজ একটা স্বভাবের পরিচয় পাওয়া গেছে তাঁর কথাবার্তায়—এমনকি কর্মস্থল আজমাবাদের জঙ্গালে এসেও কলকাতার জন-কোলাহলের জন্যে ব্যাকুল হয়েছেন, অরণ্যের ঘন নির্জনতা তাঁর আদৌ ভালো লাগেনি, চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে কলকাতায় হৈ হট্টগোলের মধ্যে ফিরে যাবার সঙ্কল্প প্রকাশ করতেও দ্বিধা করেননি।

সত্যচরণ আদ্যন্ত নাগরিক চরিত্র। কিন্তু তাঁর কর্মজীবনের গোড়াতেই বৃদ্ধ মুহুরী গোষ্ঠ চক্রবর্তীর সঙ্গে কথাবার্তায় এটুকু জানা যায় যে, গোড়ায় অরণ্যের এই নির্জনতা যতই ভয়াবহ ও পীড়াদায়ক মনে হোক্, পরে এই অরণ্যই একান্ত আপন হয়ে উঠবে। গোষ্ঠবাবুর ভাষায়—"জঙ্গালই আপনাকে পেয়ে বসবে। কোনো গোলমাল কি লোকের ভিড় ক্রমশঃ আর ভালো লাগবে না।" শিক্ষিত শহুরে যুবক সত্যচরণের মনের আয়নায় অরণ্য-প্রকৃতির যে প্রতিবিম্ব—তার মুগ্ধ ও বিস্ময়াবিষ্ট উপস্থাপনই হলো 'আরণ্যকে'র উপজীব্য বিষয়। আর সত্যচরণ নিজের উপলব্ধি মুগ্ধতা ও বিস্ময় বর্ণনায় অতুলনীয় দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

সত্যচরণ একান্তভাবেই সৌন্দর্য রসিক চরিত্র। নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে সে বলেছে—"জীবনের বেশির ভাগ সময় কলিকাতায় কাটাইয়াছি। বন্ধুবান্ধবের সঙ্গ, লাইব্রেরী, থিয়েটার সিনেমা, গানের আড্ডা—এসব ভিন্ন জীবন কল্পনা করিতে পারি না।"

একটি নাগরিক চরিত্রকে এই আরণ্য প্রকৃতি ও মানুষ কতোটা পরিবর্তিত করতে পারে এবং নগরজীবনে অভ্যস্ত একটি মানুষ কীভাবে এই আরণ্য-সমাজের সঙ্গে মিশে যেতে পারে আন্তরিক ভালোবাসায়—সে চিত্র লেখক সত্যচরণের মাধ্যমে উপস্থিত করেছেন।

সত্যচরণ রোমান্টিক কবি-স্বভাবের মানুষ, তাই নির্জন অরণ্য-প্রকৃতি তাঁকে ধীরে ধীরে মুগ্ধতার ফাঁস পরিয়েছে, গোড়ায় ভয়চকিত দৃষ্টিতে যখন অরণ্যাঞ্চলকে বিপদজনক স্থান বলে ভাবছেন—তখনও উদীয়মান চন্দ্রের সৌন্দর্য তাঁকে বড় মুগ্ধ করেছে—এ কথা জানাতে তিনি দ্বিধা করেন নি। ধীরে ধীরে বন, পাহাড়, ঝর্ণা, নদী, সূর্যোদয়-সূর্যাস্তের বর্ণবিভঙ্গ—সব কিছুকেই সত্যচরণ ভালবেসেছেন। কবি সত্যচরণ প্রকৃতির রূপে মুগ্ধ। এক জ্যোৎস্না রাত্রির বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন—সে রকম ছায়াবিহীন জ্যোৎস্না তিনি কখনো দেখেন নি। অরণ্য প্রকৃতি তার উপলব্ধির প্রকাশকে দিয়েছে কবির ভাষা।

শুধু বনভূমির বহু বিচিত্র রূপকেই সত্যচরণ ভালবাসেন নি, বনবাসী নরনারীদেরও তিনি প্রাণ ভরে ভালবেসেছেন। গরিব, অশিক্ষিত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন জীবন বিপর্যয়ে ক্ষতবিক্ষত সরল মানুষগুলিকে তিনি ভালবেসেছেন—এখানেই বোঝা যায় সত্যচরণ যেমন কবিপ্রাণ, তেমনই মানবপ্রেমিক। প্রকৃতিকে যিনি উপলব্ধি করতে জানেন প্রকৃতি সংলগ্ন মানুষ তো তাঁকে আকর্ষণ করবেই।

কিন্তু এই সত্যচরণের হাতেই অরণ্যের ধ্বংস সাধন সম্পন্ন হয়েছে। তিনি জীবনে

সে কথা ভুলতে পারেননি, বনের সৌন্দর্য তাঁর হাতেই নষ্ট হয়েছে, বন কেটে বসতের জন্যে জমি তিনিই বিলি করেছেন। নগর জীবনের চাহিদার কাছে অরণ্য প্রকৃতি বলি হওয়ার ঘটনা তাকে ব্যথিত করেছে।

সত্যনিষ্ঠ, কর্মকুশল, সৌন্দর্যের পূজারী এই উপন্যাসের চরিত্র সত্যচরণ পাঠকের এবং উপন্যাসের মধ্যে সংযোগ-সেতু। সত্যচরণ কলকাতার আড্ডাবাজ মানুষ, হৈ হট্টগোলের মধ্যেই তিনি বড় হয়ে উঠেছেন। তাই নির্জন অরণ্যে গিয়ে শুরুতেই তিনি যে হাঁফিয়ে উঠবেন—এ তো স্বাভাবিক।

কবি-প্রকৃতির এই মানুষটির কর্তব্য সম্পর্কে সজাগ দৃষ্টিও ছিল প্রখর। জঙ্গাল মহলের জমিদারির ম্যানেজার হয়ে এসে সত্যচরণ কোনো কর্তব্যেরই অবহেলা করেন নি। এমন কি বিপদের ঝুঁকি নিয়েও তিনি সারা রাত ঘোড়ায় চড়ে পুর্ণিয়ায় মোকদ্দমার তদ্বিরে যেতে দ্বিধা করেন নি।

শুধু আন্তরিক ও সহৃদয় ব্যবহার নয়, অরণ্য অঞ্চলে সম্ভাব্য কিছু কিছু গঠনমূলক কাজও করেছেন সত্যচরণ। তিনি মটুকনাথের টোল করে দেন; বিলি করা মহলে বসতি বেড়ে উঠছে দেখে সত্যচরণ সেখানে নৈশ বিদ্যালয়ের কথা ভাবেন। তিনি কাজের মানুষ, কাজ করার জন্যে সকলকেই উৎসাহ দিতেন, কাজের ব্যবস্থা করে দিতেন। লবটুলিয়ার জঙ্গালে বসতি গড়ে উঠলে গনোরী তেওয়ারীর জন্যে একটি পাঠশালা খোলার কথাও সত্যচরণ চিন্তা করেন। এগুলি তার চরিত্রের মানবিকতাকেই স্পষ্ট করে।

সত্যচরণের চরিত্রের আর একটি প্রশংসনীয় দিক হলো তাঁর নির্ভীকতা। প্রকৃতি-প্রেমিক হলেও কর্তব্যের খাতিরে অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার সাহস তাঁর ছিল। সাপ, বাঘ বা বুনো মহিষকে তিনি ভয় করেননি বটে, অরণ্যপ্রেমিক মানুষের পক্ষে সেটা স্বাভাবিক হতে পারে, কিন্তু মানুষের অন্যায় চোখ রাঙানিকেও তিনি প্রশ্রয় দেন নি। ছট্টু সিং-এর লাঠিয়ালেরা দাঙ্গা করতে আসার খবর শুনেই তিনি ঘটনাস্থলে ছুটে গেছেন এবং সেই হাঙ্গামার মোকাবিলা করেছেন; নন্দলাল ওঝা গোলাওয়ালার মতো দুর্ধর্ষ লোকের অন্যায় অনুরোধ রক্ষা করেন নি।

সত্যচরণ সত্যনিষ্ঠ এবং কর্তব্যপরায়ণ, তাই নন্দলালের ঘুষের প্রস্তাব ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাঁর চরিত্রে একটা কৌতূহল প্রবণতা ছিল, তাই তিনি সব কিছু দেখতে ও জানতে চাইতেন। রাসবিহারী সিং রাজপুতের বাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে তিনি গেছেন—নিজে যে ভীত বা পরাভূত হননি তা জানাতে এবং এ দেশের ধনী লোকের বাড়ির ব্যবস্থাদি জানতেও। আবার সাঁওতাল রাজা দেবরু পান্নার বাড়ীতে গিয়ে অনার্য রাজার পরিবর্তন যেমন উপলব্ধি করেছেন তেমনি তাঁর প্রপৌত্রী ভানুমতীর আতিথেয়তা ও ব্যবহারে মুগ্ধ হয়েছেন, যে মুগ্ধতা অরণ্যভূমি থেকে চলে আসার পরও ছিল। কতবার ভেবেছে সে আর কলকাতায় ফিরবে না—এই উন্মুক্ত, স্বাধীন বন্যজীবনে ভানুমতীর সঙ্গে ঘর বেঁধে সুখের নীড় রচনা করবে এবং এই অরণ্যেই কাটিয়ে দেবে।

সত্যচরণ অনুভূতিপ্রবণ, রোমান্টিক সৌন্দর্য-পিপাসা তাঁর চিত্তলোককে জড়িয়ে রেখেছে। অরণ্যের প্রকৃত সৌন্দর্য এবং অপ্রাকৃত মাধুর্য তীক্ষ্ণ অনুভূতির পর্দায় প্রতিফলিত হয়েছে বার বার।

সত্যচরণের চরিত্রের এই যে পরিবর্তন—অরণ্যভূমিকে ধীরে ধীরে ভালোবেসে ফেলা, প্রতিটি অপরিচিত চরিত্রের প্রতি মমত্ববোধ, এক অজানা জীবনচর্যার প্রতি আকর্ষণ এবং প্রকৃতির সৌন্দর্য অনুভব করবার সজীবতা, এই সজীবতাই তাকে চরিত্র হিসাবে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। একদিন যে ভালো কলেজের পাঠ নিয়েছে, ডিবেটিং ক্লাবের চাঁই হয়ে বক্তৃতা করেছে, জীবনে উন্নতি করার স্বপ্ন দেখেছে, আরণ্যভূমিতে বাসপর্ব প্রায় শেষ করার সময় তার মনে হয়েছে—মানুষে কি চায়—উন্নতি না আনন্দ? "উন্নতি করিয়া কি হইবে যদি তাহাতে আনন্দ না থাকে?....ভাবিতেও বেশ লাগে। কি সুন্দর স্বপ্ন! কি হইবে উন্নতি করিয়া?"

সত্যচরণের অনুতাপ হল, প্রকৃতির পূজারীর হাতেই স্বপ্নসৌন্দর্যময়ী অরণ্যভূমি ধ্বংস হয়েছে। তাই তিনি তাঁর অনুতপ্ত হৃদয়ের প্রণামী জানিয়েছেন এভাবে, 'হে অরণ্যানীর আদিম দেবতারা, ক্ষমা করিও আমায়! বিদায়!'

লেখক সত্যচরণের মাধ্যমে আরণ্য প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কের রূপটি উপস্থাপিত করেছেন শৈল্পিক দৃষ্টিতে। এই দৃষ্টি অবশ্যই বিভূতিভূষণের শিল্পদৃষ্টি।

● যুগলপ্রসাদ ঃ যথার্থ প্রকৃতিপ্রেমিক

"সরস্বতী কুণ্ডী দেবেন না হুজুর। বড় কষ্টে ওখানে গাছপালা সংগ্রহ করে এনে বসিয়েছি"—সত্যচরণের প্রতি যুগলপ্রসাদের এই উক্তি আসলে অরণ্য প্রকৃতিকে ধ্বংস করে জনপদ গড়ার বিরুদ্ধে লেখকের উক্তি এবং এ কারণেই যুগলপ্রসাদ চরিত্রটির সৃষ্টি। প্রকৃতিদৃষ্টির নিরিখে যুগলপ্রসাদ ও সত্যচরণ পরিপূরক চরিত্র।

উদ্ভিদতত্ত্ব বিশারদ যুগলপ্রসাদ লবটুলিয়ার পাটোয়ারী বনোয়ারীলালের চাচাতো ভাই। সে একটু খামখেয়ালী, খাপছাড়া, উদাসীন ধরনের লোক। সামান্য লেখাপড়া সে জানে, ধরমপুর অঞ্চলে তার বাড়ি। বয়স্ক লোক, মাথায় তার কাঁচাপাকা চুল।

যুগলপ্রসাদ ভবঘুরে প্রকৃতির। যদিও সে বিবাহিত, তবু সংসারের কাজকর্ম দেখে না, বরং বলা যায় সংসার সম্পর্কে সে নিরাসক্ত। বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতেই তার ভালো লাগে। সে বৃক্ষপ্রেমিকও বটে। বনে ফুলের চারা পুঁততে, যে ফুল যে অঞ্চলে নেই, সেই ফুলের বীজ বা গাছ সেখানে পুঁতে ফুল ফলাতে তার বড় ভালো লাগে—এটা তার নেশা বলা যায়। এই নেশার আনন্দেই সে মশগুল থাকে।

পূর্ণিয়ায় কোন্ এক সাহেবের বাগানে ভারি চমৎকার এক বিলিতি লতানে গাছ ও তার রাঙা রাঙা ফুল দেখে সেই ফুলের বীজ এনেছে সে—জঙ্গলে পুঁতবে বলে।

যুগলপ্রসাদ যথার্থই একজন পুষ্পরসিক, নানা ধরনের ফুল ফোটানোই তার শখ; বিনা স্বার্থে, বিস্তৃত বনভূমির সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্যে নিজের পয়সা ও সময় ব্যয় করতে কুণ্ঠা নেই যুগলপ্রসাদের। লবটুলিয়ায় যে বিচিত্র ফুল ও লতা—তা দশ বারো বছর আগে লছমী-পুর স্টেটের পাহাড়ী জঙ্গল থেকে এনে যুগলপ্রসাদই লাগিয়েছিল। ফুল ফুটলেই তার আনন্দ, সে আর কিছু চায় না।

ফুল, ফলের বীজ, লতাপাতা সম্পর্কে অভিজ্ঞতাও তার প্রচুর। বৈষয়িক কথাবার্তা যুগলপ্রসাদের ভালো লাগে না। জমি-জমা, গরু-মোষের আলোচনা করতে সে মোটেই ভালোবাসে না। 'আরণ্যক' উপন্যাসের এক বিচিত্র ধরনের চরিত্র হলো যুগলপ্রসাদ।

জমি বিলি করার ফলে জঙ্গল সাফ করে ফেলা হচ্ছে, বন কেটে বসতের উদ্যম চলছে, সেই সময়ও যুগলপ্রসাদ সৌন্দর্য সন্ধানে ব্যস্ত। এমনকি সরস্বতী কুণ্ডীর আশেপাশের জমি হস্তান্তর করতে বারণ করে যুগলপ্রসাদ সত্যচরণকে বলে, "সরস্বতী কুণ্ডী দেবেন না হুজুর। বড় কষ্টে ওখানে গাছপালা সংগ্রহ করে এনে বসিয়েছি।"

বিষয়বিমুখ এই মানুষটা সাংসারিক উন্নতির কথা ভাবেনি, কি করে বনের সৌন্দর্য বাড়ে—সেই ভাবনাতেই ব্যস্ত থেকেছে। যুগলপ্রসাদ যথার্থই প্রকৃতিপ্রেমিক, প্রকৃতিকে সাজাতেই সে ব্যস্ত।

উপন্যাসের অষ্টম পরিচ্ছেদের তৃতীয় পর্বে লবটুলিয়ার উত্তর প্রান্তে মনোরম হ্রদ সরস্বতী কুণ্ডীর ধারে প্রথম এক দ্বিপ্রহরে সত্যচরণ মানুষটির সাক্ষাৎ পায়। অবাক হয়েছে সত্যচরণ, হবারই কথা, কারণ—'লোকটা সম্পূর্ণ বিনাস্বার্থে একটা বিস্তৃত বন্যভূমির সৌন্দর্য বৃদ্ধি করিবার জন্য নিজের পয়সা ও সময় ব্যয় করিতেছে।' অবশ্য আগ্রাসী প্রয়োজনের কাছে তার প্রকৃতি প্রেমের মূল্য নিতান্ত তুচ্ছ।

উপন্যাসের শেষে আমরা যুগলপ্রসাদকে আরো বেশি করে দেখতে পাই। ষোড়শ পরিচ্ছেদের তৃতীয় পর্বে যুগলপ্রসাদ এসেছে জ্যোৎস্না রাতে সত্যচরণের সঙ্গে গল্প করতে। আবার সর্বশেষ পরিচ্ছেদে ভানুমতীর সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার সময় সত্যচরণ সঙ্গে নিয়েছে যুগলপ্রসাদকে। সে রাতে যুগলপ্রসাদের আর একটি গুণের পরিচয় পাওয়া যায়, সে রাঁধেও খুব ভালো—'যুগলপ্রসাদের হাতের রান্নাও চমৎকার।' সেদিন মাষকলাইয়ের ডাল, ভাত এবং পাখির মাংস রান্না করে খাইয়ে সবাইকে সে তৃপ্তি দিয়েছে। কিন্তু এ পরিচয় তার গৌণ, যুগলপ্রসাদের আসল পরিচয় সে আদ্যন্ত অরণ্যপ্রেমিক। তাই ফুলটি ফুটতে দেখলেই তার আনন্দ, আর কিছু সে চায় না। সত্যচরণ ও যুগলপ্রসাদ উভয়ে প্রকৃতিপ্রেমিক হলেও সত্যচরণ শিল্পাকাঙ্ক্ষার প্রতীক, যুগলপ্রসাদ সেই আকাঙ্ক্ষার পরিপূরক, শিল্পস্রষ্টার ইচ্ছা তার আছে।

● গনৌরী তেওয়ারী ঃ দুরাগত অন্নলোলুপ এক সাধারণ মানুষ

"হুজুর, সবাই বললে ফুলকিয়ার কাছারিতে ম্যানেজার এসেছেন, সেখানে গেলে ভাত খেতে পাওয়া যাবে, তাই ওরা এল, ওদের সঙ্গে আমিও এলাম। ....আমি নিজে আজ ভাত খেলাম বোধহয় তিনমাস পরে।" —দুরাগত অন্নলোলুপ এক সাধারণ মানুষ হিসেবে 'আরণ্যক'-এর গনৌরী তেওয়ারী পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

গনৌরী তেওয়ারী-কে প্রথম আমরা দেখি দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের দ্বিতীয় পর্বে। ত্রিশ-বত্রিশ বছর বয়স তার, শ্যামবর্ণ দোহারা চেহারা, মাথায় বড় বড় চুল, কপালে দুটি লম্বা ফোঁটা বিরাজমান। লবটুলিয়ায় সত্যচরণ যখন প্রথম এসেছে তখন নিতান্ত রবাহূত এই লোকটি অনেক দূরের ভীমদাসটোলা থেকে এখানে ছুটে এসেছে।

গনৌরী বিনয়ী ও অনুগত, সত্যচরণের প্রতি কথার উত্তরে সে 'হুজুর' শব্দটি যোগ করতে ভোলে না। গনৌরী ভীমদাসটোলায় থাকে, তার যখন বারো বছর বয়স, তার বাবা মারা যায়, তখন তার এক বৃদ্ধা পিসিমা তাকে মানুষ করে। সেই পিসিমা গত হলে গনৌরী নিজের ভাগ্য অন্বেষণ করতে বেরিয়ে পড়ে। কখনো সে গ্রামে গ্রামে ঘুরে এ-বাড়ি সে-বাড়ি ভিক্ষে করে; কখনো ঠাকুর পুজো করে, কখনো গ্রাম্য পাঠশালায় পণ্ডিতি করে। খুব কষ্ট করে দিন গুজরান করে, এত গরিব যে সে নিজের পেটই

চালাতে পারে না, সে কথা কবুল করে, সে আরো বলে—তাই সে বিয়ে করার কথা কোনোদিন ভাবেনি। নিজের আহার কষ্ট করেই সে জোটায়; কলাইয়ের ছাতু, চীনা ঘাসের দানার রুটি খায়।

লবটুলিয়ার জঙ্গলে যারা মোষ চরাতে এসেছে তাদের কাছে খাদ্য ভিক্ষে করে বেড়ায় গনোরী। ভাত খেতে পাবে—এই কথা শুনে সে কয়েক মাইল পথ হেঁটে এসেছে। তিন মাস পরেও যদি একদিন সে ভাত খেতে পায়—তবে খুশিতে সে মেতে ওঠে। কিন্তু শীর্ণ চেহারার গনোরী খেতে পারে খুব, তার এক তাল ছাতু মাখা দেখে সত্যচরণ বিস্মিত হন, রোগা চেহারার গনোরী খাবে কি করে ঐ বিপুল পরিমাণ মাখা কলাইয়ের ছাতু। গনোরী সরল, বড় সাদাসিধে ধরনের লোক।

গনোরী চরিত্রটিকে আবার আমরা দেখি দীর্ঘদিন পরে—উপন্যাসের ষোড়শ পরিচ্ছেদের দ্বিতীয় পর্বে। লবটুলিয়ায় এক গৃহস্থ বাড়িতে গনোরীকে দেখতে পেয়ে তার সম্বন্ধে খোঁজখবর নিয়েছে সত্যচরণ। গনোরী বরাবরই ভবঘুরে প্রকৃতির, গাঁয়ে গাঁয়ে পাঠশালা করে অর্থাৎ ছেলে পড়িয়ে আহারের সংস্থান করেছে কখনো, কখনো বা তা হয়নি। একসময় বিয়ের কথা হয়েছিল, লোকেরা কানভাঙানি দিয়ে সে সম্বন্ধ ভেঙে দিয়েছে। দিয়ে যে ভালোই করেছে, তা স্বীকার করে গনোরী। বলে, 'আমাকে কেন দেবে? সত্যিই তো। আমার কি আছে বলুন না?'

লবটুলিয়ায় একটা পাঠশালা খুলে থাকতে পারে কিনা জিজ্ঞাসা করেছিল গনোরী, সত্যচরণ কী ভেবেছে, ঔপন্যাসিক সে কথা বলেছেন— 'তখনই মনে মনে ভাবিলাম এখানে একটা পাঠশালা করিয়া দিয়া গনোরীকে রাখিয়া দিব।' বোধহয় গনোরী সত্যচরণের দ্বারা উপকৃতই হয়েছিল।

● রাজু পাঁড়ে ঃ দার্শনিক ও প্রকৃতিপ্রেমিক

মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কের স্বরূপ মেলে ধরতে যে সব চরিত্রের আমদানি লেখক করেছেন, তার মধ্যে অন্যতম হলেন রাজু পাঁড়ে। জঙ্গলমহালের বিচিত্র ধরনের মানুষের মধ্যে রাজু পাঁড়ে স্বতন্ত্র। তার দার্শনিক সত্তা প্রকৃতিদৃষ্টিকে দিয়েছে পূর্ণতা।

রাজু পাঁড়ে এক বিচিত্র ধরনের মানুষ, গৌরবর্ণ, সুপুরুষ। পঞ্চান্ন ছাপান্ন বছর তার বয়স, চেহারা বেশ সুগঠিত, কোনো রকমেই তাকে বুড়ো বলা যায় না। সুন্দর স্বাস্থ্যের অধিকারী সে। কপালে তিলক আঁকা।

লবটুলিয়া বইহারের উত্তরে দু বিঘে জমি বন্দোবস্ত করে দেওয়া হয়েছে তাকে। লোকটি গরীব। শুধু গরীব নয়, বন সাফ করে ফসল ফলাতেও সে তৎপর নয়। জমি চাষের জন্যে বেশি সময় দিতে সে পারে না, সকালটা যায় তার পূজোআচ্চা করতে। বইটইও সে রোজ পড়ে; হিন্দি লেখাপড়া সে জানে, সংস্কৃতও সামান্য জানে।

একা মানুষ, কাঠা পনেরোর মতো জমিতে মাঝে মাঝে সময়ে অসময়ে চীনা ঘাসের দানা বুনেছে, মকাই অবশ্য করেনি। পূজা-আচ্চা করে সে বাকী সময় চাষবাসে কাজে লাগায়।

রাজু ভক্ত মানুষ। তার ঈশ্বর ভাবনাও অনবদ্য। তার সরল বিশ্বাসও প্রশংসনীয়। ছোট কালো পাথরের একটা রাধাকৃষ্ণের মূর্তি তার খুপরির ঘরে রেখেছে, বনের ফুল

তুলে রোজ সে ঐ মূর্তি পুজো করে। সকালে পূজা ও গীতাপাঠ করতেই তার দশটা বাজে। সন্ধ্যায়ও তার পূজাপাঠ আছে। মাঝে মাঝে অবকাশ-সময়ে দূরের আকাশ এবং পাহাড় দেখে, কখনো বা কবিতা লেখে।

রাজু লাজুক প্রকৃতির লোক। নিজের সম্পর্কে সে বিশেষ কিছু বলে না। সে ঈশ্বর বিশ্বাসী ব্যক্তি। তার সম্পর্কে যতদূর জানা গেছে, তাতে দেখা যায়—তার তিন ছেলে, দুই মেয়ে আর এক বিধবা বোন—এদের নিয়েই তার সংসার; এদের খাওয়ানোর জন্যেই সে এই জঙ্গলে এসে এখানে জমি নিয়েছে।

রাজু কিছুটা দার্শনিক প্রকৃতির। জঙ্গল কাটতে গিয়ে সে ভাবতে বসে—ফুলের দল কতকাল থেকে প্রকৃতির শোভা বাড়িয়ে আছে, পাখিরা ডাকছে। বাতাসের সঙ্গে পা মিলিয়ে দেবতারা পৃথিবীর মাটিতে পা দেন, তবে যেখানে টাকার লোভ বড় হয়, দেনা পাওনার কাজ চলে, সেখানে ওঁরা থাকেন না।

রাজু লবটুলিয়া বইহারের গভীর জঙ্গলে একা থাকে। সে শান্ত প্রকৃতির। নিজের মনোজগতের মধ্যেই শান্তিতে থাকতে ভালবাসে। রাজুর মতবাদগুলি তার একেবারে নিজস্ব; যেমন—উইঢিবি থেকে রামধনু জন্মায়, নক্ষত্রের দল হলো যমের চর। রাজুর আরো বিশ্বাস যে—আকাশের যেমন শেষ নেই, তেমনি পৃথিবীরও শেষ নেই।

অল্পবিস্তর কবিরাজী চিকিৎসার চর্চা করতো রাজু। বনের গাছগাছড়ার শেকড়বাকড় দিয়ে সে কবিরাজী চিকিৎসা চালাতো, তাতে কখনো সখনো দু-এক পয়সা আসতো। রাজুর মধ্যে একটা পরোপকারী সেবাব্রতী সত্তা আছে। শুয়োরমারিতে ভয়াবহ কলেরার খবর পেয়ে রাজু সেখানে গিয়ে গ্রামের অসুস্থ কলেরা রোগীকে জড়িবুটি ও শেকড়বাকড়ের ওষুধ দিয়ে বাড়ি বাড়ি গিয়ে রোগীর সেবা করে বেড়িয়েছে। তার নিঃস্বার্থ পরোপকার বৃত্তি প্রশংসনীয়।

গহন অরণ্যে একাই একটি খুপরি বানিয়ে রাজু পাঁড়ে বাস করে। সারাদিন কাজ করে, তিনটে মোষ চরায়। দুধ দোয়া, মাখন তোলার কাজ, পূজার্চনা, রামায়ণ পাঠ, রান্না খাওয়া, দেড় বিঘে জমির চাষ—এর ওপর সারারাত জেগে বাঘ তাড়ানোর জন্যে ক্যানেস্ত্রা পেটাতে হয়। রাজু সত্যিই কাজের লোক। সারাদিন খাটে, সন্ধ্যেবেলা ভজন গান করে, ভগবানের নাম নেয়। সেই নির্জনতার মধ্যে রাজু দিব্যি আনন্দে একাই কাটিয়ে দেয়। শখের মধ্যে তার একটিমাত্র শখ হলো চা পান করা। চা তার একমাত্র সাংসারিক আকর্ষণের বস্তু। এই ব্যাপারেও সে বিনয়ী, সৌজন্যপরায়ণ ও ভদ্র।

রাজুর জীবনেও রোমান্স আছে। যখন তার সতেরো-আঠারো বছর বয়স—তখন সে উত্তর ধরমপুর শ্যামলাল টোলাতে এক টোলে ব্যাকরণ পড়তে যায়; সেই টোলের শিক্ষকের মেয়ে সর্জু (সরযূ), তার বয়স তখন চোদ্দ বছর, রাজুর চোখে বড় সুন্দর ঠেকলো। রাজু তার প্রেমে পড়ে গেল। পরে বিয়েও হয় তার অধ্যাপক কন্যার সঙ্গে। সেই বউ আজ ষোলো-সতেরো বছর হল গত হয়েছে, এখনো রাজুর স্মৃতিতে মাঝে মাঝে জেগে ওঠে। এই প্রেমের স্মৃতি তাকে কবি করে তুলেছে, আধ্যাত্মিক দিকে পরিচালিত করেছে।

প্রকৃতির মধ্যে যারা বেড়ে উঠেছে তারা প্রকৃতির এই বিশালতা, ঈশ্বরের এই দান সম্বন্ধে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সচেতন নয়। পাঁড়ের এই দার্শনিক মনোভাব সত্যচরণকে

বিহ্বল করেছে বলেই তিনি এই চরিত্রটি সম্পর্কে বিশেষ আকর্ষণ বোধ করেছেন। উপন্যাসে রাজু প্রকৃতিপ্রেমের স্মারক ও সম্পূর্ণ এক চরিত্র।

● ধাওতাল সাহু ঃ মহাজন ও লক্ষপতি

"এ অঞ্চলে প্রজা, জোতদার, জমিদার, ব্যবসাদার প্রায় সকলেই ধাওতাল সাহুর খাতক।" এক বড় মহাজন ও লক্ষপতি লোক হিসেবে 'আরণ্যক' উপন্যাসে ধাওতাল সাহু চিত্রিত। তবে টাকার কুমির হয়েও সে দরিদ্রের মতো জীবনযাপন করে এবং লেখক তার সম্বন্ধে জানিয়েছেন, "একটি অতি অদ্ভুত লোকোত্তর চরিত্রের মানুষ।" তার কারণ তথাকথিত কুসিদজীবী চরিত্র ধাওতাল নয়, বরং সে নিরীহ, ভাল মানুষ ও পরোপকারী। তার বাইরের মহাজনী বৃত্তির মধ্যেও অন্তরের মানবিক দিকটি লেখক উজাড় করে দেখিয়েছেন।

ধাওতাল সাহু চরিত্রটি 'আরণ্যক' উপন্যাসে নতুন ধরনের স্বাদ এনেছে। সে নওগাছিয়ার লোক, কাছারির দক্ষিণ-পূর্বে অন্তত বারো তেরো মাইল দূরে তার বাড়ি। ষাট বছরের ওপর তার বয়স; রোগা চেহারা, গায়ের রং কালো, পরনে মলিন থান আর মেরজাই, খালি পা। সে যেমন পরিশ্রমী তেমনি চিন্তাধারায় স্বচ্ছ ও বলিষ্ঠ।

ধাওতাল সাহু ভালো মানুষ, নিরীহ প্রকৃতির লোক। এই রকম নরম স্বভাবের মানুষ, মহাজন হলে বহু লোক তো তার টাকা মেরে দেবে। অনেকে তার টাকা মেরে দেয়। কিন্তু ধাওতাল তবু লোকের অনুরোধ এড়াতে পারে না, টাকা ধার দেয়। তার মনোভাব হলো—সুদ দেবে বলে যখন লিখে দিচ্ছে তখন টাকা ধার দেওয়া উচিত।

মামলা করে টাকা আদায় করা তার স্বভাব নয়। সে তাগাদা করে, দিচ্ছি দেব করে অনেকেই টাকা দেয় না। পনেরো-ষোলো হাজার টাকার তামাদি দলিল সে অনায়াসে বাজে কাগজের মতো ছিঁড়ে ফেলে দেয়।

তবু ধাওতাল টাকা ধার দিতে কুণ্ঠিত হয় না। সে বলে—সবাই তো ফাঁকি দেয় না। সে মানুষের সততায় বিশ্বাস রাখে। সে ঈশ্বরবিশ্বাসী ধর্মভীরু মানুষ। ধাওতাল তাই সত্যচরণকে বলেছে, "সবাই ফাঁকি দেয় না হুজুর! এখনও চন্দ্র-সূর্য উঠছে, মাথার উপর দীন-দুনিয়ার মালিক এখনও আছেন।"

সে নিজে রাঁইচি আর রেড়ির বীজ বিক্রি করে টাকা করেছিল। তাই দিয়ে মহাজনী কারবার শুরু করে। নিজে পরিশ্রম করে সেই সঞ্চিত অর্থে মহাজনী বৃত্তি করে, কিন্তু সে লোক ঠকায় না।

ধাওতাল সাহু সত্যচরণকে একসময় সাড়ে তিন হাজার টাকা ধার দেয় শুধু মুখের কথায়। রেভিনিউ দাখিল করার টাকা কম পড়ায় সত্যচরণ বাধ্য হয়ে ধাওতাল সাহুর কাছে যান এবং ঐ টাকা ধার নেন। কিন্তু সত্যচরণ যতদিন না ঐ টাকা শোধ করে দেন, ততদিন ধাওতাল ইসমাইলপুরের ধারে কাছে আসেনি, পাছে সত্যচরণ ভাবেন যে ধাওতাল টাকার তাগাদা দিতে এসেছে।

ধাওতাল সাহু সম্বন্ধে সত্যচরণ তাই যথার্থই বলেছে— "চিত্তে নিস্পৃহতা ও বৃহৎ ক্ষতিকে তাচ্ছিল্য করিবার ক্ষমতা যদি দার্শনিকতা হয়, তবে ধাওতাল সাহুর মত দার্শনিক আমি তো অন্তত দেখি নাই।" তাছাড়া সে মহাজন হয়েও রাসবিহারী সিং-এর মতো মহাজন ছিল না। আবার সে 'মার্চেন্ট অব ভেনিস'-এর শাইলকও নয়।

● নৃত্যশিল্পী কিশোর ঃ ধাতুরিয়া

'আরণ্যক' বিচিত্র চরিত্রের মেলা, তার মধ্যে নৃত্যশিল্পী কিশোর ধাতুরিয়া অন্যতম। চরিত্রটির কথা বলতে গিয়ে লেখক মন্তব্য করেছেন—'ধাতুরিয়া ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। তাহার মধ্যে যে একটি নির্লোভ সদাচঞ্চল, সদানন্দ, অবৈষয়িক, খাঁটি শিল্পী মনের সাক্ষাৎ পাইয়াছিলাম, শুধু সে বন্য দেশ কেন, সভ্য অঞ্চলের মানুষের মধ্যেও তা সুলভ নয়!'

ধাতুরিয়া বারো-তেরো বছরের একটি ছেলে, নাচের দলের সঙ্গে সে ঘুরে বেড়ায়। তার এক মাথা ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া কালো চুল, সুন্দর চোখ মুখ, গায়ের রঙ কালো, সারা অঙ্গে অপূর্ব লাবণ্য, ঠিক যেন যাত্রাদলের শ্রীকৃষ্ণ। দক্ষিণ দেশে যে বছর অজন্মার জন্যে দুর্ভিক্ষ হয়, সেবার গ্রামের কিছু লোক দল বেঁধে নাচ দেখাতে বের হয়, এই ছোট ছেলেটিও ঐ দলে এসে জোটে। সংসারে ওর আপন বলতে কেউ ছিল না। ছোট্ট ছেলে, গাঁয়ের সব লোকের সঙ্গে থাকে—তাই ও দলে আছে, একলা থাকতে মন কেমন করবে। এই বয়সে নেচে গেয়ে পরের মন জুগিয়ে নিজের পেট চালাবার ব্যবস্থা করতে হয়, চীনা ঘাসের দানা আর নুন, ক্বচিৎ বুনো সব্জির একটা তরকারি যদি জোটে। তাও নেচে যে ধাতুরিয়ার ভালোভাবে চলে যায় এমন নয়; যখন নাচের বায়না থাকে না, তখন সে ক্ষেত-খামারে কাজ করে।

একটা জাত-শিল্পীর শিল্পীসুলভ নিস্পৃহতা ধাতুরিয়ার মধ্যে ছিল। সত্যচরণ তাকে কাছারির কাছে জমি দিতে চেয়েছিলেন যাতে চাষ করে সে ভালোভাবে নিজের পেট চালাতে পারে। ধাতুরিয়া কিন্তু ম্যানেজারের মুখের ওপর না বলতে পারলেও জমি সে নেয়নি। বৈষয়িক বুদ্ধি তার ছিল না, শিল্পীসত্তাই সে মনে মনে লালন করতো।

ধাতুরিয়ার একটা দুর্মর বাসনা ছিল কলকাতায় যাবার জন্যে। কলকাতা সম্পর্কে তার ধারণা ছিল যে কলকাতায় নাচ গানের সমাদর আছে। সে যে সব ভালো ভালো নাচ শিখেছে, এখানে এই জঙ্গলমহলে সে সব নাচ দেখার লোক নেই। সেজন্যে তার বড় দুঃখ। ছক্করবাজি নাচ না নেচে তো সে ঐ নাচ ভুলতে বসেছে। নাচতে তার বড় ভালো লাগে। ছক্করবাজি নাচ সে বহু কষ্ট করে শিখেছে; গয়া জেলার তিনটাঙা গ্রামের এক নামকরা বৃদ্ধ ওস্তাদ ভিটলদাসের কাছ থেকে। যথেষ্ট কষ্ট করে এবং সতেরো ক্রোশ পথ হেঁটে গিয়ে তার হাতে পায়ে ধরে তবে এই ছক্করবাজি নাচ শিখতে পেরেছে সে।

তার নাচ শেখার প্রতি যত্ন ও চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। অনেক ধরনের নাচই সে শিখেছে, দু-একটি মুদ্রাও রপ্ত করেছে। অনেক পরে যখন সে কাছারি বাড়িতে নাচ দেখাতে আসে, তখন দেখা যায়—নৃত্যকলায় সে যথেষ্ট উন্নতি করেছে। তবে কলকাতায় যাবার আগ্রহ তার বেড়েছে; সত্যচরণকে সে অনুরোধ করে—এবার কলকাতায় যাবার সময় যেন তিনি ধাতুরিয়াকে সঙ্গে নিয়ে যান। কিন্তু কলকাতায় ধাতুরিয়ার আর যাওয়া হয়ে ওঠে নি। মাস দুই পরে খবর পাওয়া গেল—ধাতুরিয়া রেলে কাটা পড়ে মারা গেছে। এটা দুর্ঘটনা না আত্মহত্যা, তা লেখক জানান নি।

নির্লোভ, সদাচঞ্চল, সদানন্দ, অবৈষয়িক, খাঁটি শিল্পীমনের সেই নাটুয়া বালক ধাতুরিয়ার স্নিগ্ধতা ও লাবণ্যমাখা মুখ সভ্য মানুষের পরিমার্জিত মণ্ডলেও দেখা যায় না—চিরকালের জন্যে সে হারিয়ে গেল! তার জন্য বড় দুঃখ হয় সকলের; শুধু সত্যচরণের নয়, পাঠক-পাঠিকাদেরও।

● গাঙ্গোতা গিরিধারীলাল ঃ সাচ্চা মানুষ

সত্যচরণ গিরিধারীলালকে কখনো ভুলবেন না—একথা জানিয়ে চরিত্রটিকে স্বীকৃতি দান করেছেন। জাতিভেদ ও কুসংস্কারের দিকটিও লেখক এই চরিত্র চিত্রণ প্রসঙ্গে দেখিয়েছেন।

গিরিধারীলালের বাড়ি কড়ারী তিনটাঙায়, জাতিতে সে গাঙ্গোতা। ওর একটি ছেলে ছাড়া সংসারে আর কেউ নেই; অত্যন্ত গরিব মানুষ। দৈনিক চার আনা মাইনে আর খাওয়া—এই শর্তে সে মেলায় ইজারাদারের আদায়কারী হিসেবে কাজ পেয়েছে।

গিরিধারীলালের বয়স পঞ্চাশ-ষাটের মতো হবে, খালি গা; গায়ের রঙ কালো, মাথার চুল কাঁচা পাকা মেশানো। হাতে একটা বড় থলিতে পয়সা আর বগলে একখানা খাতা, মেলার খাজনা আদায় করে বেড়ায় ও ব্রয়া মাহাতোকে হিসাব বুঝিয়ে দেয়।

তার চোখ মুখে একটা অসম্ভব দীন নম্রভাব রয়েছে। সেই নম্রভাবের সঙ্গে একটু যেন ভয়ের ভাবও রয়েছে। এই নম্রভাব তার মুখে দেখে সত্যচরণ পর্যন্ত বিস্মিত হয়েছেন। তিনি স্বীকার করেছেন যে, এমন দীন বিনম্র মুখ তিনি আর কখনো দেখেন নি।

গিরিধারীলালকে অনেক পরে অসুস্থ অবস্থায় লবটুলিয়া জঙ্গলে দেখা গেল, একটা অর্জুন গাছের নীচে ছেঁড়া ময়লা কাপড় পেতে শুয়ে আছে। লোকজন তাকে বস্তিতে ঢুকতে দেয় না, ঢিল ছুঁড়ে মারে। সত্যচরণ তাকে দেখে চিনতে পারেন এবং কাছারিতে চারপাইতে তুলে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করেন। প্রশ্ন করে জানা গেল, কেটে গিয়ে তার ঘা হয়—সেই ঘা কিছুতেই সারে না। যে যা বলে, সে তাই করে, কিন্তু ক্রমেই বেড়ে যায়। সকলে বললে—তার কুষ্ঠ হয়েছে। চার মাস তাই সে কষ্ট পাচ্ছে। বস্তিতে কেউ ঢুকতে দেয় না, ভিক্ষে করে কোনো রকমে চালায়, রাত্রে থাকার জায়গা নেই।

গিরিধারীলাল ক্ষুধার্ত ছিল,সত্যচরণ তাকে গরম দুধ খাওয়াবার ব্যবস্থা করে দিলে, সে কিছুটা সুস্থ বোধ করলো। রাজু পাঁড়ের দ্বারা তার চিকিৎসার ব্যবস্থা হলো; কিন্তু ঘা ধোওয়ানো, ওষুধ লাগানোর কাজে কোনো লোককে পাওয়া গেল না, তখন সত্যচরণ কুন্তাকে গিরিধারীলালের সেবা কাজে নিযুক্ত করেন এবং কুন্তাও গিরিধারীলালকে পিতৃজ্ঞানে নিঃস্বার্থভাবে বিনা পারিশ্রমিকে সেবা করতে থাকে। গিরিধারীলালকে সে বাবা বলে ডাকতে শুরু করে।

গিরিধারীলাল দরিদ্র কিন্তু খাঁটি মানুষ, সততার দ্বারা গড়া, ব্রয়া মাহাতোর হয়ে মেলায় দোকানীদের কাছ থেকে কাঁচা পয়সা খাজনা নিয়ে ঠিক ঠিক হিসাব বুঝিয়ে দিয়েছে। পরের কাছে লেবু চেয়ে অপমানিত হয়েছে—তাই নিজের জমিতে সে লেবুর চারা বসিয়েছে, অপমানবোধ তাকে সচেতন করেছে। সত্যচরণ বলেছেন—এই লোকটিকে তিনি জীবনে ভুলবেন না! সত্যিই গিরিধারীলালের মতো সরল সাচ্চা সাদাসিধে মানুষকে ভুলে যাওয়া পাঠকের পক্ষে সম্ভব নয়।

তার সততার সম্পর্কে সত্যচরণ প্রশংসার কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন—"অনেক ধরনের মানুষ দেখিয়াছি, কিন্তু গিরিধারীলালের মতো সাচ্চা মানুষ কখনও দেখি নাই।" সত্যচরণের মনে এই মানুষটির ছবি চিরকাল আঁকা হয়ে আছে। কেননা অরণ্য প্রকৃতির মতো স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বচ্ছ চরিত্র হল গিরিধারীলাল।

● কল্যাণকামী পণ্ডিতজী ঃ মটুকনাথ পাঁড়ে

"কে পড়বে টোলে পণ্ডিতজী, বুনো মহিষ ও নীল গাইয়ের দল কি ভট্টি বা রঘুবংশ বুঝবে?"— সত্যচরণের প্রতি মটুকনাথ পাঁড়ের এই উক্তি প্রমাণ করে মটুকনাথ একজন সেকেলে মাস্টারমশাইর প্রতিনিধিস্থানীয় চরিত্র হলেও অরণ্য পরিবেশে বেশ মানানসই।

চরিত্রটির সঙ্গে সত্যচরণের প্রথম দেখা হয় লবটুলিয়ার উত্তরে নাঢ়া-বইহারের মুক্ত প্রান্তরে। সেখানে ষাট বছরের এই বৃদ্ধ, পরনে ময়লা কাপড় ও গায়ে একটা ছেঁড়া কাপড়—বসেছিল একটা পাথরের ওপর। জীবিকার অন্বেষণে বেরিয়েছে, নিপাট ভাল মানুষ। সত্যচরণ তাকে টোল খোলার প্রস্তাব দিলে মটুকনাথ বলেছেন, "কে পড়বে টোলে পণ্ডিতজী, বুনো মহিষ ও নীল গাইয়ের দল কি ভট্টি বা রঘুবংশ বুঝবে?"

তাকে দু-চারদিনের জন্য আশ্রয় দিয়েই সত্যচরণ বুঝতে পেরেছে তাকে দিয়ে বিশেষ কোন কাজ হবার নয়— 'কিছু সংস্কৃত পড়িয়াছে, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কাজ করিতে পারে। টোলে ছাত্র পড়াইত, আমার কাছে বসিয়া সময়ে-অসময়ে উদ্ভট শ্লোক আবৃত্তি করিয়া বোধহয় আমার অবসর বিনোদনের চেষ্টা করে।'

মটুকনাথের বংশ মর্যাদার জন্যে বেশ গর্ববোধ ছিল, তা ছাড়া চাষবাসের সে কিছুই বোঝে না, সেজন্যে সে-কাজে সে রাজি নয়। বংশানুক্রমে শাস্ত্রব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সে। তার জন্যে একটা টোল খুলে দেবার সে আকুল প্রার্থনা জানায়—সত্যচরণের কাছে। সত্যচরণ একটি ঘর বাঁধিয়ে দিয়ে মটুকনাথের টোল খুলিয়ে দিলেন। পূজার্চনা করে ব্রাহ্মণ ভোজন করিয়ে মটুকনাথ টোলের উদ্বোধন করলে। কোনো ছাত্র না জুটলেও সে নিত্য সকালে স্নান ও আহ্নিক সেরে টোল ঘরে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ খুলে জোরে জোরে সূত্র আওড়ায়, যেন কাউকে পড়াচ্ছে।

মটুকনাথ অব্যবসায়ী, কাজে তার নিষ্ঠা আছে। নিজের এই শ্রম এবং অধ্যবসায়ে পরে সে টোল জমিয়েছে। প্রথমে মটুকনাথের একটি ছাত্র জুটেছিল। নিজের দারিদ্র্য ভুলে গিয়ে তার প্রতি সে যথেষ্ট যত্নশীল হয়েছে, তার আহারের ব্যবস্থা পর্যন্ত করেছে।

তার অনেক ছাত্র যে ব্যাকরণ শিখতে আগ্রহী ছিল না, শুধু কিছু খেতে পাব বলেই টোলের ছাত্র সেজে এসে জুটেছে—মটুকনাথ সে কথা জেনেও জানতো না। তার বংশে টোলের ছাত্রকে আহার দিয়ে পড়ানোর রেওয়াজ ছিল, মটুকনাথ সেই প্রথা অনুসরণ করেছে। বংশগৌরব রক্ষার জন্যেই মটুকনাথ তার ছাত্রহীন টোলে নিজের হাতে সরস্বতী মূর্তি গড়ে পূজো করেছিল।

মটুকনাথ আত্মমর্যাদাসম্পন্ন মানুষ। টোলের জন্যে জমি ও ঘর ছাড়া আর কখনো কিছু সে ম্যানেজারের কাছে চায় নি। অনাহারে থাকলেও সে সত্যচরণের কাছে সাহায্যের জন্যে কোনোরকম অনুরোধ করেনি।

মটুকনাথ সরল মানুষ, লোভী নয়, স্বার্থপর নয়। শিক্ষাদান করে ছাত্রকে মানুষ করে গড়ে তোলার জন্যে সে সদাসচেষ্ট; তার বিদ্যা ও বুদ্ধি যতটুকু ততটুকু দিয়েই সে ছাত্রদের কল্যাণ করতে চায় এবং এতেই তার সন্তুষ্টি।

● আত্মভোলা কবি ঃ বেঙ্কটেশ্বর প্রসাদ

অরণ্য অঞ্চলে আত্মভোলা কবিরূপে কিম্বা কবি হওয়ার আত্মপ্রসাদে সন্তুষ্ট বেঙ্কটেশ্বর প্রসাদ চরিত্রটি লেখকের কলমে জীবন্ত হয়ে রয়েছে। বিহারের পাটনা থেকে এসে সে থাকে চকমকিটোলায়। সত্যচরণের কাছে নিজের লেখা কবিতা শোনাতে সে উপস্থিত হয়েছে। যুগলপ্রসাদের মতো বেঙ্কটেশ্বর প্রসাদও খামখেয়ালী মানুষ, একজন কবি অন্যজন সৌন্দর্যপ্রেমিক।

সে শুনেছে কাছারিতে কলকাতা থেকে বাঙালীবাবু এসেছেন, বাঙালীরা সমঝদার লোক, কবিতার কদর বেশ বোঝেন, তাই সে তিন মাইল পথ হেঁটে বাঙালীবাবুর কাছে কবিতা শোনাতে এসেছে। প্রায় ঘন্টা দুই ধরে কবিতা শোনালো বেঙ্কটেশ্বর। কবিতা অবশ্য তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু নয়, তবু সৌজন্যের খাতিরে সত্যচরণ সেই কবিতার প্রশংসা করলেন। সেই কবিতা কাগজে ছাপানোর কথা উঠলে বেঙ্কটেশ্বর বললে—এ দেশের লোক তাকে পাগল বলে, তাকে ঠিকমতো বোঝবার লোক এ দেশে নেই।

বেঙ্কটেশ্বর নিজে এসে চকমকিটোলায় তার বাসায় সত্যচরণকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গেল। সেখানে কবি এবং কবিপত্নীর আন্তরিক আতিথ্য ও আপ্যায়ন বিশেষ স্মরণযোগ্য। সত্যচরণ নিজে থেকে বেঙ্কটেশ্বরের একটি কবিতা শোনার বাসনা প্রকাশ করলেন, বেঙ্কটেশ্বর তখন দীর্ঘ একটি প্রেমের কবিতা পড়লেন।

বেঙ্কটেশ্বর বড় কবি নয়, কিন্তু কবিতার প্রতি তার নিষ্ঠা ও আগ্রহ কম নয়। বরং বলা যায় যে কবিতা-অন্ত-তার প্রাণ, জীবনে কবিতাই তার একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান।

সত্যচরণকে বাড়িতে পৌঁছে দেবার সময় একটা বড় বটগাছ দেখিয়ে বলেছে—'ওর তলায় সেবার সভা হয়েছিল, অনেক কবি মিলে কবিতা পড়েছিল। এদেশে বলে মুসায়েরা। আমারও নিমন্ত্রণ ছিল। আমার কবিতা শুনে পাটনার ঈশ্বরীপ্রসাদ দুবে—চেনেন ঈশ্বরীপ্রসাদকে? ভারী এলেমদার লোক, 'দূত' পত্রিকার সম্পাদক—নিজেও একজন ভাল কবি—আমায় খুব খাতির করেছিলেন।' এরকম আত্মতুষ্ট ব্যক্তি দুর্লভ।

● আদিম পাহাড়ী জাতির প্রতিনিধি ঃ দোবরু পান্না

"এদেশের সকল আদিম জাতি এখনও তাঁকে রাজার সম্মান দেয়"—আদিম জাতীয় পাহাড়ী দেশের রাজা দোবরু পান্না বীরবর্দী সম্পর্কে সত্যচরণ বুদ্ধু সিং-এর মুখে একথা শুনেছে। 'আরণ্যক' উপন্যাসে উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক চরিত্র এই দোবরু পান্না। লেখক দেখিয়েছেন এক কালের আভিজাত্য থেকে মানুষ কীভাবে নিঃস্ব হয়ে যায়। তা না হলে ১৮৬২-র সাঁওতাল বিদ্রোহে নেতৃত্ব দানকারী দোবরু পান্না-কে চরম দারিদ্র্যে দিন কাটাতে হয়! বিরানব্বই বছরের বৃদ্ধকে গরু চরাতে হয়! শিকার ও গোচারণই এখন তার জীবিকা।

তিনি যে যৌবনে অতিশয় সুপুরুষ ছিলেন তার ছাপ এখনো তাঁর চেহারায় আছে। বৃদ্ধ রাজা দোবরু পান্না বলেন—তাঁরা সূর্যবংশীয়, এককালে এসব অঞ্চলেরই রাজা ছিলেন, কিন্তু কোম্পানীর সঙ্গে লড়ে হেরে যান।

রাজা দোবরু পান্না অতিথিপরায়ণ, তাঁর বংশে সকলেই অতিথির প্রতি সদাশয় ব্যবহার করেছেন। দোবরু নিজের বংশগৌরব সম্পর্কে খুব সচেতন। তাই অতিথির প্রতি কোনো ত্রুটি যাতে না হয়—সে দিকে তাঁর যথেষ্ট নজর; সত্যচরণের আহার যাতে সুসম্পন্ন হয় সেজন্যে তিনি রান্না ঘরের দরজায় গিয়ে বসেছিলেন।

দোবরু পান্নার সৌজন্যবোধও খুব প্রখর। সত্যচরণের আহারের পর তিনি বললেন—আমার বেশি ঘরদোর নেই, আপনাদের বড় কষ্ট হলো। সত্যচরণ প্রাচীন রাজবাড়ির ভগ্নচিহ্ন এবং এই রাজবংশের ঠাকুর দেখতে চাইলেন, তখন বৃদ্ধ দোবরু সঙ্গে গেলেন, পাহাড়ের উচ্চ এক উপত্যকায় উঠলেন কোনো দ্বিধা না করেই।

রাজবাড়ির ভগ্নাবশেষ দেখাবার পর দোবরু পান্না রাজবংশের সমাধিস্থলও দেখালেন। প্রকাণ্ড রাজবাড়ির জীর্ণ ভগ্নাবশেষ এখনো প্রাচীন রাজবংশের গৌরব ঘোষণা করছে— দোবরুর পূর্বপুরুষেরা এখানে বাস করতেন—একথা বলতে দোবরু পান্নার বেশ গর্ববোধ হয়। পূর্বপুরুষদের প্রতিষ্ঠিত দেবতা এখনো সেখানে আছেন। ঝুলন উৎসবের ব্যাপারও তাঁর বংশগৌরবের চিহ্নস্বরূপ। সত্যচরণ দোবরু পান্নার পুরাতন আভিজাত্য গৌরবের স্মারক দেখে অভিভূত যে হয়েছিলেন, তা তাঁর উপলব্ধিতে প্রকাশিত হয়েছে, "অপরাহ্নের সেই ঘনায়মান ছায়া এই সুপ্রাচীন রাজ-সমাধিকে যেন আরও গম্ভীর, রহস্যময় সৌন্দর্য দান করিল।"

দোবরু দেবতায় বিশ্বাসী, তাঁদের কুলদেবতা হচ্ছেন টাঁড়বারো। তিনি বন্য মহিষের দেবতা। তিনি জাগ্রত দেবতা—দোবরু এই দেবতাকে খুব বিশ্বাস করেন। এই টাঁড়বারো বুনো মহিষদের শিকারী মানুষের পাতা ফাঁদ থেকে রক্ষা করেন।

বৈষ্ণবের কাণাকড়ি যার অবশিষ্ট নেই, সম্বল বলতে যার গোচারণ, সেই মানুষও বংশগৌরবের কথা বললে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে, অতিথিকে আপ্যায়নের জন্য রাজকীয় গাম্ভীর্যে নির্দেশ দেয় এবং নিজেদের পুরাকীর্তি যত্নসহকারে ঘুরে দেখায় অতিথিকে। চরিত্রের এই গভীর আভিজাত্যবোধ এবং সম্ভ্রমবোধের কারণেই একটি অতি বৃদ্ধ সাঁওতাল চরিত্র এই উপন্যাসে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। দোবরু বর্তমানে নিঃস্ব হলেও তার আভিজাত্য ও বংশমর্যাদার স্বরূপ তার চরিত্রে বর্তমান।

● গাঙ্গোতাদের কাটুনী শ্রমিক ঃ নকছেদী ভকত

সত্যচরণ তাঁর অরণ্য জীবনের অভিজ্ঞতায় খুব কাছে থেকেই সাধারণ মানুষের জীবন যন্ত্রণা ও দারিদ্র্যকে উপলব্ধি করেছিলেন। উপন্যাসে দারিদ্র্যের সেই কঠিন রূপ চিত্রিত হয়েছে গাঙ্গোতা সম্প্রদায়ের লোক কাটুনী শ্রমিক নকছেদী ভকতের মাধ্যমে। বছরের বেশির ভাগ সময় এরা জীবিকার প্রয়োজনে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ঘুরে বেড়ায় এবং ফসল কাটার কাজে এরা দক্ষ। নকছেদী দক্ষিণ ভাগলপুর থেকে এসে থাকার জন্য ছোট খুপরি বানিয়ে নিয়েছে। দারিদ্র্য থাকলেও এই শ্রেণির মানুষেরা যে দারিদ্র্যকে বরণ করে নিতে জানে—সেদিকটি লেখক উপন্যাসে দেখিয়েছেন। বছরের অধিকাংশ সময় এরা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ঘুরে বেড়ায় ও ফসল কাটার কাজ করে—নকছেদী তাদেরই একজন।

নকছেদী প্রায় বার্ধক্যে উপনীত, তার দুই স্ত্রী। প্রথমা স্ত্রী হলো প্রৌঢ়া তুলসী; তুলসীর কয়েকটি ছেলেমেয়ে। আর দ্বিতীয়া স্ত্রী স্বাস্থ্যবতী একেবারেই তরুণী

মঞ্জী—সত্যচরণ তাকে দেখে প্রথমে নকছেদীর মেয়ে বলে ভেবেছিলেন। নকছেদী মেয়ের বয়সী মঞ্জীকে বিয়ে করতে কুণ্ঠিত হয় নি।

সংসারের কর্তা হিসেবে নকছেদীর কোনো বুদ্ধি-বিবেচনার পরিচয় পাওয়া যায় না, বরং একদা সে একটা মস্ত ভুল করে; আর তার সেই ভুলের জন্যেই তার তরুণী ভার্যা মঞ্জী তাদের ছেড়ে পালিয়ে গেছে। অন্য এক মহালে ফসল কাটার সময় গভর্ণমেন্টের লোক বসন্তের প্রতিষেধক টীকা কাটুনী শ্রমিক পরিবারে দিতে এলে নকছেদী চার আনা পয়সা ঘুষ দিয়ে লোকটাকে ভাগিয়ে দেয়, কাউকেই টীকা নিতে দেয়নি। মঞ্জীর ছেলেটার বসন্ত হলো, মারাও গেল। তারপর সে পাগল হয়ে গিয়েছিল।

নকছেদী দুঃখী, কিন্তু পরিশ্রমী মানুষ। কাটুনী মজুর হিসাবে সে কাজ করে। মজুরি হিসাবে সে আর মঞ্জী যা পায়—তা দিয়েই কোনো রকমে সংসার পালন করে। প্রচণ্ড শীতে লেপ কাঁথা তো দূরস্থান, গায়ে জামা জোটে না। রাতে ছেলেমেয়েরা কলাইয়ের ভুষির মধ্যে শুয়ে থাকে। নকছেদী বলে, এতে শরীর বেশ গরম থাকে—'দুখানা কম্বল গায়ে দিলেও অমন ওম্ হয় না।'

এজন্যে নকছেদীর কোনো দুঃখ বা ক্ষোভ নেই। খাদ্য হিসাবেও ঘাটো অর্থাৎ মকাই সেদ্ধ খেতে হয় নুন দিয়ে, কখনো যদি তার সঙ্গে বুনো শাকের তরকারি জোটে তো ভালো। তাতেও তার কোনো দুঃখ নেই।

মঞ্জীকে অবশ্য ভালোবাসতো নকছেদী, তার চলে যাওয়াতে সে ব্যথিত হয়েছে, কান্নাকাটিও করেছে। ম্যানেজার সত্যচরণকে দেখে হাউমাউ করে কেঁদে উঠে নকছেদী মঞ্জীর জন্যে দুঃখ প্রকাশ করেছে। তরুণী স্ত্রীর বায়না সামলাতে, তার মন রাখতে নকছেদী অনিচ্ছা সত্ত্বেও কিছু পয়সা ব্যয় করতো। নকছেদীকে প্রজা হিসেবে প্রথম জমি দিয়েছিলেন সত্যচরণ, সত্যচরণের সহানুভূতির স্পর্শে সে ধন্য হয়েছিল।

● পেশাদার মহাজন ও খল চরিত্র ঃ রাসবিহারী সিং

ধাওতাল সাহু ও রাসবিহারী সিং উভয়ে মহাজন হলেও উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য সহজেই নজরে আসে। ধাওতাল সাহু কুসিদজীবী হলেও তার মনটি ভাল কিন্তু রাসবিহারী সিং পেশাদার মহাজন ও খল চরিত্র। তাই উপন্যাসে জঙ্গলমহালের অত্যাচারী দুর্দান্ত মহাজন, সুদখোর, লাঠিয়াল রূপেই রাসবিহারী সিং চিত্রিত হয়েছে।

রাসবিহারী সিং অত্যন্ত দুঁদে লোক, গরীবকে মেরে, তাদের রক্ত চুষে সে বড়লোক হয়েছে। তার প্রতাপ খুব, গরীবেরা তাকে রাজার মতো মান্য করে, তার ভয়ে কাঁপে। অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন মানুষেরা তাকে কিছু বলতে সাহস করে না। তার সম্বন্ধে মুনেশ্বর সিং যথার্থই বলেছে, "...কত খুন করেছে জীবনে তার লেখাজোখা আছে হুজুর? ওর অসাধ্য কাজ নেই—খুন, ঘরজ্বালানি, মিথ্যে মকদ্দমা খাড়া করা, ও সবটাতেই মজবুত।" বিভূতিভূষণ খল চরিত্র অঙ্কনে পটু না হলেও এই চরিত্রটি সুচিত্রিত।

রাসবিহারী সিং রোজ সকালে দেড় সের দুধ আর এক সের বিকানীর মিছরি খেয়ে জলযোগ করে। আস্তাবলে সাত-আটটি ঘোড়া। একটা ঘরে লাঠি, ঢাল, সড়কি, বর্শা, টাঙি, তলোয়ার রয়েছে—যেন একটি অস্ত্রাগার। শীঘ্র হাতি কেনার ইচ্ছাও তার আছে।

রাসবিহারী সিং-এর লাঠিয়াল দলটি মারামারিতে বিশেষ পটু। রাসবিহারী সিং

সাংঘাতিক হিংস্র প্রকৃতির, যে তাকে যথেষ্ট মর্যাদা দেয় না, তাকে সে খুন করতেও দ্বিধা করে না। বৃদ্ধ মুনেশ্বর সিং বলে যে রাসবিহারী সিং জীবনে কত যে খুন করেছে—তার হিসেব লেখা-জোখা নেই। ওর অসাধ্য কোনো কাজ নেই। খুন, ঘরজ্বালানি, মিথ্যে মোকদ্দমা খাড়া করা—এই সব কাজেই রাসবিহারী সিং ওস্তাদ।

রাসবিহারী সিং অতিশয় সম্পন্ন ধনী মহাজন। সত্যচরণকে একবার রাসবিহারী সিং তার বাড়ির হোলির উৎসবে যোগ দিতে নিমন্ত্রণ করে। রাসবিহারী সিং খল, অসাধু এবং অতিশয় পাজী—এ কথা বলে সত্যচরণের কাছারির অনেকেই এই নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে সত্যচরণকে নিষেধ করে।

রাসবিহারী সিং দাম্ভিক ও রাশভারী লোক; নিজের সম্মান সম্পর্কে সে খুব সজাগ। পান থেকে চুন খসলেই তার মান চলে যায়, তাই তার সঙ্গে ব্যবহার করতে সকলেই খুব সতর্ক হয়। গাঙ্গোতা প্রজারা তো তার ভয়ে সর্বদা তটস্থ হয়ে থাকে।

রাসবিহারী সিং রাজপুতের ঋদ্ধির প্রাচুর্য আছে, কিন্তু রুচিবোধ নেই। অর্থ আছে, কিন্তু শালীনতা নেই। পরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দর্যবোধের কোনো বালাই নেই রাসবিহারীর।

কুন্তাকে ভুল বুঝিয়ে সে নিজের বাড়িতে এনে তুলেছিল কু-মতলবে, কিন্তু চরিত্রবতী কুন্তা রাসবিহারী সিং-এর বিশ্রী প্রস্তাব ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেছে, ছেলেমেয়েদের নিয়ে আসার সময় রাসবিহারীর মুখের ওপর বলে এসেছে যে, জান্ দেবে তবু ধর্ম দেবে না।

রাসবিহারী সিং সম্পর্কে সত্যচরণের এই মূল্যায়নই সঠিক—"বর্বর প্রাচুর্য বলিতে যা বুঝায়, তাহার জাজ্বল্যমান চিত্র দেখিলাম রাসবিহারীর সংসারে। যথেষ্ট দুধ, যথেষ্ট গম, যথেষ্ট ভুট্টা, যথেষ্ট বিকানীর মিছরি, যথেষ্ট লাঠিসোটা। ....দেওয়ালে চুনের দাগ, পানের দাগ, বাড়ির পিছনে নর্দমা অতি কদর্য নোংরা জল ও আবর্জনায় বোজানো। গৃহস্থাপত্য অতি কুশ্রী। ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া করে না, নিজেদের পরিচ্ছদ ও জুতা অত্যন্ত মোটা ও আধ ময়লা। ...এ বর্বর প্রাচুর্য তবে কোন্ কাজে লাগে?" অর্থাৎ প্রভাব ও প্রতিপত্তিকেই রাসবিহারী বড় করে দেখে বলেই তার মধ্যে মনুষ্যত্বের বড়ই অভাব।

● শঠ প্রকৃতির মানুষ ঃ নন্দলাল ওঝা

রাসবিহারী সিং-এর দোসর হল নন্দলাল ওঝা। জমিদারী অঞ্চলের বাইরে জঙ্গলের উত্তর-পূর্ব কোণে বসবাসকারী নন্দলাল ওঝা চরিত্রটি খল চরিত্র রূপেই চিত্রিত হয়েছে। সে জাতিতে মৈথিল ব্রাহ্মণ, বয়স পঞ্চাশ বছরের কাছে, চেহারায় বৃদ্ধ বলা যায়। লোকটি আপাত বিনয়ী। সত্যচরণের সঙ্গে দেখা করতে এসেই সুপারি কেটে সেই কাটা সুপারি দিয়ে সত্যচরণকে প্রথম সম্ভাষণ করে।

নন্দলাল অত্যন্ত শঠ প্রকৃতির মানুষ। সত্যচরণকে হাত করে সে তার বড় ছেলেকে লবটুলিয়ার কাছারির তহশীলদারের কাজে লাগাবার মতলব ভাঁজে। সেই উদ্দেশ্যে অতি বিনয়ের সঙ্গে এসে সে সত্যচরণকে বিশেষভাবে পীড়াপীড়ি করে তার বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে যায়। পরে নন্দলাল নিজের হাতি পাঠিয়ে সত্যচরণকে তার বাড়ি নিয়ে যায়। অভ্যর্থনা এবং আপ্যায়নও যথেষ্ট। নন্দলালের সব প্রজাকেও জড়ো করা হয়েছিল। ভোজের আয়োজনও ছিল প্রচুর। সত্যচরণকে সন্তুষ্ট করবার চেষ্টাটাই নন্দলালের মধ্যে প্রকটভাবে স্পষ্ট হয়েছিল; সেই সঙ্গে পরোক্ষভাবে বোঝানো

হয়েছে যে নন্দলাল ওঝা এই অঞ্চলের একজন প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি। তার মধ্যে সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিন্দুবিসর্গ নেই, বরং উদগ্র অর্থলিপ্সা ও নির্লজ্জতা তার চরিত্রে বর্তমান।

সত্যচরণ যখন নন্দলালের বাড়ি থেকে চলে আসছিলেন, তখন বিদায়কালে ছোট থলি ভর্তি টাকা দিয়ে নন্দলাল জানালে—হুজুরের নজর। সত্যচরণ তা থেকে একটা টাকা তুলে নিয়ে বাকী টাকা নন্দলালকে ফেরৎ দিলেন।

সত্যচরণকে নিমন্ত্রণ এবং এইভাবে আপ্যায়ন করা যে নন্দলালের একটা ছল-চাতুরী—তা বোঝা গেল পরদিনই যখন নন্দলাল তার বড় ছেলেকে নিয়ে কাছারি বাড়িতে হাজির হয়ে ছেলের তহশীলদারের চাকরির কথা বললে। এজন্যে সে সত্যচরণকে টাকা ঘুষ দেবার কথা বলতে কুণ্ঠাবোধ করলো না। প্রথমে নন্দলাল পাঁচশো টাকা দেবার কথা বলে। ক'দিন পরে নন্দলাল জানায়— বারোশ' পর্যন্ত টাকা সে পান খেতে দিতে পারে। নন্দলাল যে কত ধূর্ত এবং কেমন ভয়ানক প্রকৃতির মানুষ—সত্যচরণ তা হাড়ে হাড়ে টের পেয়ে যান।

প্রকৃতির রাজ্যে যেখানে শোভা, স্নিগ্ধতা ও সৌন্দর্য, সেখানে সরল, প্রাণখোলা গো-বেচারী মানুষের মেলা—সেখানেও চাঁদের কলঙ্ক রেখার মতো চতুর বুদ্ধিধর শয়তান-কল্প নন্দলাল ওঝা গোলাওয়ালার মতো মানুষও আছে। 'আরণ্যক' উপন্যাসের লেখক মানব জাতির মধ্যে সব রকমেরই লোক যে সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে—সেই সত্য কথাটা জানাবার জন্যেই এই উপন্যাসে এমন খল চরিত্রের আমদানি করেছেন। অরণ্য অঞ্চলে যে কুৎসিত প্রকৃতির লোক ছিল, নন্দলাল তার দৃষ্টান্ত।

● রোমান্টিক প্রকৃতির বন্যবালা রাজকুমারী ঃ ভানুমতী

অরণ্য পরিবেশে রোমান্টিক চরিত্রের মানুষ রাজকন্যা ভানুমতী 'আরণ্যক' উপন্যাসের আকর্ষণীয় চরিত্র। ভানুমতী রাজা দোবরু পান্না বীরবর্দীর নাতির মেয়ে। ষোলো-সতেরো বছরের ভানুমতী সুশ্রী, সহজ সরল ও সপ্রতিভ। শহুরে মেয়ের মতো তার লজ্জা বা আড়ষ্টতা নেই। অরণ্য পটভূমিতে সত্যচরণের মনে হয়েছে ভানুমতী যেন রূপকথার নায়িকা।

ভানুমতী সরল সঙ্কোচহীন মেয়ে। ফলের থালা থেকে পেঁপের টুকরো সত্যচরণের হাতে তুলে দিতে ভানুমতীর কোনো দ্বিধা বা সঙ্কোচ দেখা যায় নি। চালচলনেও ভানুমতীর কোনো জড়তা নেই। অপরিচিত মানুষের সঙ্গে তার ব্যবহার একেবারে স্বাভাবিক ও সম্পূর্ণ বাধাহীন। প্রকৃতির কোলে মানুষ বলেই এমন মুক্ত, দৃঢ় অথচ উদার তার ভালোবাসা। মন বড় বলে এই পল্লীবালাদের ভালবাসাও বড়।

সংস্কারের চাপে, সভ্যতার শাসনে ভানুমতীর আদিম নারী-আত্মার মৃত্যু হয়নি। আপন স্নেহময়ী ভগ্নীর মতোই সহৃদয় আন্তরিক ব্যবহার ছিল ভানুমতীর।

সত্যচরণ প্রথম ভানুমতীকে দেখেই বুঝেছিলেন মেয়েটির মধ্যে সপ্রতিভ একটি আভিজাত্যের ছাপ আছে। ভানুমতীর বেশভূষা সাধারণ, পরনের কাপড়টি পর্যন্ত প্রমাণ মাপের নয়, কিন্তু তবু সেই বেশভূষাতেই সহজ সৌন্দর্য ও রুচিবোধের একটা ছাপ আছে। তাতে বোঝা যায় যে সে অভিজাত বংশেরই মেয়ে। দয়ামায়া, স্নেহমমতায় ভরা সত্যচরণের মনে রোমান্টিক স্বপ্ন বাসা বাঁধে।

ভানুমতী সহজেই মানুষকে আপন করে নিতে জানে, সত্যচরণকে ভানুমতী মুহূর্তকালেই পরিবারের বন্ধু বলে মেনে নিয়েছিল। দোবরু পান্নার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে সত্যচরণ যখন রাজবাড়িতে যান, তখন ভানুমতী সত্যচরণের কাছে এসে কাঁদতে লাগলো—ঠিক যেমন পরমাত্মীয়ের কাছে মানুষ শোক প্রকাশ করে তেমনভাবে।

সত্যচরণের মনেও রোমান্টিক একটি স্বপ্ন বাসা বাঁধে—এই নির্মল নিরালা অরণ্য আবহে যদি ভানুমতীকে বিয়ে করে বাকী জীবনটা কাটানো যায়—মন্দ হয় না, সরলা বন্যবালা ভানুমতী, জ্যোৎস্না-ধোওয়া প্রান্তরের পটভূমিতে কি অপূর্ব না দেখায় তাকে।

কিন্তু স্বপ্ন স্বপ্নই থাকে। বাস্তবে তা ফলে না। ভানুমতী সেই অরণ্যে ধনঝরি পাহাড়ের সানুপ্রান্তরে নিজের মনের সারল্য আর আনন্দ নিয়ে বন্যবালা হয়েই রয়ে গেল। উপন্যাসের শেষে সত্যচরণের মনে হয়েছে, "....ভানুমতী তাহাদের সেই শৈলবেষ্টিত আরণ্যভূমিতে কি করিতেছে, ...।" আসলে ভানুমতী অরণ্য পরিবেশের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত চরিত্র।

● মুসম্মত কুন্তা ঃ ভাগ্যনিপীড়িত চরিত্র

মুসম্মত কুন্তা 'আরণ্যক' উপন্যাসের ভাগ্য নিপীড়িতা চরিত্র হলেও মহিয়সী নারী। কুন্তা দুঃখিনী হলেও সহিষ্ণুতা ও সম্মান বোধে অনন্যা। মানুষের অমানবিক ব্যবহারের শিকার স্নেহবঞ্চিতা কুন্তা সত্যচরণের কাছে প্রথম মানবিক ব্যবহার পেয়েছিল। সত্যচরণ তার সম্পর্কে জানিয়েছে, "আমার বিদায় লইয়া আসিবার সময় একটি মেয়ে কাঁদিয়াছিল। আজ সকাল হইতে আসিয়া সে কাছারির উঠানে দাঁড়াইয়া ছিল—আমার পাল্কী যখন তোলা হইল তখন চাহিয়া দেখি সে হাপুস-নয়নে কাঁদিতেছে।"

দেবী সিং-এর বিয়ে করা বউ হলো কুন্তা। দারিদ্র্যে, দুঃখ-দুর্দশায়, অনাহারে গুটিকয় ছেলেমেয়ে নিয়ে অসহায় অবস্থায় থাকলেও এখনো কুন্তার চেহারায় রুক্ষ মলিনতা বাসা বাধেনি। কুন্তার জীবনে শান্তির ভাগ কম, বিপর্যয়ের বেদনাই বেশি। সত্যচরণের আনুকূল্যে কুন্তা জমি নিয়ে সকলের সহযোগিতায় চাষ করে নিজেদের জীবনধারণের মানকে পাল্টে ফেলেছিল।

বিবাহিত জীবনের প্রথম পর্বটা কুন্তার সুখেই কেটেছে। বাঈজীর মেয়ে বিয়ে করেছে বলে দেবী সিং রাজপুতকে সকলে একঘরে করে দেয়। বিত্তশালী শক্তিমান দেবী সিং এসব সামাজিক শাসনের কোনো কিছু গ্রাহ্য করেনি। কুন্তাকে সে বিলাসিতার মধ্যেই রেখেছিল। রূপোর ঝালর দেওয়া পালকিতে চেপে কুন্তা কুশী নদীতে স্নান করতে যেত, বিকানীর মিছরি খেয়ে জল খেত। মর্তবানে সে গম কাটা ক্ষেত থেকে গুঁড়ো কুড়িয়ে এনে ছেলেমেয়েদের খাওয়ায়।

দেবী সিং রাজপুতের সোহাগিনী স্ত্রী কুন্তা স্বামীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই দুঃখিনী নারীতে পর্যবসিত হয়ে গেল। বাঈজীর মেয়ে বলে সকলেই মনে করে—কুন্তার কোনো জাত নেই। গুটিকয় ছেলেমেয়ে নিয়ে চরম দারিদ্র্যের মধ্যে সে পড়ে।

কুন্তার আত্মমর্যাদাজ্ঞান প্রখর। সে খেতে পায় না বটে, ছেলেমেয়েদেরও খাওয়াতে পারে না, কিন্তু কখনো কারুর কাছে হাত পেতে কিছু ভিক্ষে করে না। তবে ম্যানেজার সত্যচরণের পাতের ভাত তরকারি নিতে তার মর্যাদায় বাধে না, কারণ সে মনে করে পাতের ভাত নিলে কোনো অপমান নেই।

এক সময় কুলের জঙ্গালে কুন্তা ছোট ছেলেমেয়েদের খাওয়াবে বলে এক টুকরি কুল পেড়েছিল, ইজারাদার তার চুলের মুঠি ধরে টেনে আনছিল, সে সময় সত্যচরণ গিয়ে পড়েন। লজ্জায় কুন্তা কুলের ঝুড়ি আর আঁকশি ফেলে চলে যায়, সেদিন থেকে সে আর কোনো দিন ম্যানেজারের পাতের ভাত পর্যন্ত নিতে আসেনি।

রাসবিহারী সিং কুন্তাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে যায় এই বলে যে সে রাজপুত জাত ভাইয়ের স্ত্রী, সে এমন অসহায় ও আশ্রয়হীন হয়ে থাকবে—সেটা রাজপুতদেরই পক্ষে অগৌরবের ব্যাপার, তাই কুন্তা তার বাড়িতেই থাক। কুন্তা সরল নারী, সে রাজী হয়ে গেল। রাসবিহারী সিং-এর লালসা-লোলুপ কুশ্রী রূপ সে দেখতে পায়নি, কিন্তু অচিরেই রাসবিহারী সিং-এর কুপ্রস্তাব শুনে কুন্তা পালিয়ে আসে। রাসবিহারী সিং ছোরা নিয়ে তাকে ভয় দেখালে সে জোরের সঙ্গে বলেছে—"মেরে ফেল বাবুজী, জান্ দেগা—ধরম দেগা নেহিন্।"

কুন্তা বড় দুঃখী এবং অসহায়ও বটে, কিন্তু তার মুখে সাহস এবং পবিত্রতার একটা দুর্লভ জয়চিহ্ন আঁকা হয়ে গেছে। তাই দুঃখ, বিপর্যয়, লাঞ্ছনা, অপমান—কোনো কিছুকেই সে গ্রাহ্য করে না। দেবী সিং মারা যাবার পরে সবই তার গা-সওয়া হয়ে গেছে।

মানুষের অমানবিক ব্যবহারের শিকার এই কুন্তা প্রথম মানবিক ব্যবহার ও স্বীকৃতি পেয়েছিল সত্যচরণের কাছে। সত্যচরণ তাকে দশ বিঘে জমি বিনা সেলামিতে বিলি করেছেন, প্রথম দু বছরের খাজনাও মাপ করে দিয়েছেন। এই দয়ায় বিগলিতচিত্ত কুন্তা শুধু চোখের জলেই সত্যচরণকে কৃতজ্ঞতা নিবেদন করেছে। ছট পরবে সে সত্যচরণকে পিঠে করে দিয়ে এসেছে, তার সঙ্গে দুটি ফলও দিয়েছে, অন্তরের নীরব শ্রদ্ধা জানিয়েছে।

কুন্তার মধ্যে একটি সেবাপরায়ণা নারী ছিল; সে অসুস্থ গিরিধারীলালের সেবা করতে নিজেই রাজী হয়েছে, পয়সার বিনিময়ে নয়, রোগীর সেবা মানবিক কর্তব্য, সেই কর্তব্যের টানেই কুন্তা এগিয়ে এসেছে। গিরিধারীলালকে সেবা দিয়ে সে সুস্থ করে তুলেছে, বিনিময়ে কোনো পয়সা নেয়নি। গিরিধারীলালকে সে বাবা বলেছে।

তুচ্ছের মধ্যেও যে উচ্চ আদর্শ থাকে—কুন্তা চরিত্রই তার প্রমাণ। "প্রেমের উজ্জ্বল বর্তিকা এই দুঃখিনী রমনীর হাতে এখনও সগৌরবে জ্বলিতেছে, তাই ওর এত দুঃখ দৈন্য, এত হেনস্থা, অপমান। প্রেমের মান রাখিয়াছে কুন্তা।"

● প্রাণচঞ্চল ও সারল্যের প্রতিমূর্তি ঃ মঞ্জী

"মেয়ে কি হুজুর। ও যে আমার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী"—সত্যচরণের প্রশ্নের উত্তরে নকছেদী ভকতের এই উত্তরে সত্যচরণ বিস্মিত হলেও আসলে মঞ্জী ছিল নকছেদীর কাছে 'বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা'। মঞ্জীর বয়স চব্বিশ-পঁচিশ বছর, স্বাস্থ্যবতী, নিটোল গড়ন, সপ্রতিভ ও সহজ সরল স্বভাবের।

গাঙ্গোতা কাটুনী মজুর নকছেদী ভকতের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী হলো মঞ্জী। মঞ্জীর রং বার্নিশ করা কালো। দেহাতী হিন্দি ভাষায় মিষ্টি সুরে সে কথা বলে।

বইহারের মেলা তার ভালো লেগেছে। বালিকাসুলভ একটা চাপল্য যেমন মঞ্জীর আছে, তেমনি আছে একটা সারল্যও। মেলায় মুখে কে ঢোলক বাজিয়েছিল—তা শুনে

সে মুগ্ধ হয়েছে, তার প্রশংসায় সে পঞ্চমুখ। মঞ্জী নাচগান এবং তামাশায় খুব আমোদ পায়, মেলায় যা-কিছু দেখেছে, মহাখুশিতে তার বর্ণনা দিতেও তার কম আনন্দ নয়।

বালিকা-বয়সের মনটা তার এখনো যায় নি। মেলায় জিনিসপত্র কেনার ঝোঁক তার মধ্যে খুব বেশি। শখের জিনিস বেশি দাম দিয়ে কিনেছে সে। চিরুনি, বাজে সাবান, নীল ও হলদে হিংলাজের মালা—এসব জিনিস কিনে মঞ্জী শুধু খুশি নয়, বেশ গর্বিত বটে। তার চোখে মুখে গর্ব ও আনন্দের রেশ ফুটে উঠেছে। সভ্য, শিক্ষিত মেয়ের মতো সে তার মনের ভাব লুকোতে শেখে নি। সহজ, অনাবিল গর্ব ও আনন্দের একটা প্রকাশ মঞ্জীর মুখের ওপর ফুটে ওঠে। মঞ্জী মেলায় যে জিনিসপত্র কিনেছিল তা সস্তা কিনা সত্যচরণকে জিজ্ঞাসা করায় সত্যচরণ উপলব্ধি করেছিল, "এই সরলা বন্য মেয়েরা জিনিসপত্রের দাম জানে না, খুবই সহজ এদের ঠকানো।"

মঞ্জী আদিম গ্রাম্য বালিকার মতো সরল, ফসল কাটা শেষ হলে যাবার সময় মঞ্জী আগামী বছর আবার আসবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেল সত্যচরণকে। বলে গেল—জংলী হরিতকীর আচার বানায় তারা, সেই আচার আনবে ম্যানেজার সত্যচরণের জন্যে।

মঞ্জী অতিথিপরায়ণও বটে। পরের বার মিছি নদীর উত্তর পাড়ের জঙ্গল থেকে ফেরার সময় সত্যচরণকে মঞ্জী দেখতে পায় দূরের ক্ষেতে কাজ করতে করতে; সে দৌড়ে এসে জোর করে তাঁকে ঘোড়া থেকে নামিয়ে তাদের বাস করার খুপরিতে নিয়ে গেল। স্নানাহারের ব্যবস্থা করলে, কুন্তীর দূষিত জলে সত্যচরণ স্নান করতে চান না শুনে মঞ্জী এক টিন জল ফুটিয়ে দিলে। সে জাতিতে গাঙ্গোতা বলে উঁচু জাতের মানুষকে রান্না করে খাওয়ালে পাপ হবে, এই বোধ থাকায় সে বলে, "তা হবে না বাবুজী, আপনিই রাঁধুন। একদিনের জন্যে আপনার জাত কেন মারব? আমার পাপ হবে।"

মঞ্জী তেজী মেয়ে। সূরয কুণ্ডে পাণ্ডারা তাকে স্নান করতে দেয় নি। সে তখন তর্ক করেছে, বলেছে—পাহাড়ী ঝর্ণা—যে সে এখানে নাইতে পারে। গাঙ্গোতা জাতের মেয়ে বলে তাকে স্নান করতে বাধা দেবে কেন কিন্তু পাণ্ডারা তাকে মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে, জলে নামতে দেয়নি। তার যুক্তির কথা কেউ মানে নি; গরিব কাটুনী মজুরদের কথা কে আর মানছে।

মঞ্জীর মধ্যে সর্বদাই একটা প্রাণচাঞ্চল্য ছিল, সে যেন আনন্দ, স্বাস্থ্য এবং সারল্যের প্রতিমূর্তি। সে যেন বনভূমির বনলক্ষ্মী, পূর্ণযৌবনা, প্রাণময়ী, তেজস্বিনী, অথচ মুগ্ধা, অনভিজ্ঞা, বালিকা-স্বভাবা। মঞ্জীর এই স্বভাব বৈশিষ্ট্য সত্যচরণকে মুগ্ধ করেছিল।

কিন্তু এই মঞ্জী নিজের সংসার ছেড়ে পালিয়ে গেল এক রাজপুত যুবকের সঙ্গে। তার ছেলেটা বসন্ত রোগে মারা যায়, তার বৃদ্ধ স্বামী নকছেদীর দোষেই ছেলেটাকে হারাতে হয়েছিল। বসন্তের প্রতিষেধক টীকা দেবার লোককে চার আনা পয়সা ঘুষ দিয়ে ফিরিয়ে দিয়েছিল, নকছেদীর সংসারের কাউকে টীকা দিতে দেয় নি।

মঞ্জীর ছেলেটা মারা যেতে সে শোকে দুঃখে বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে। সেই সময় রাজপুত যুবকটা তাকে ভুলিয়ে নিয়ে পালিয়েছে; সরল গ্রাম্য মেয়েদের ফাঁদে ফেলা বড় সহজ। হয়তো ভবিষ্যতে মঞ্জী আসামের কোনো চা-বাগানে মেয়ে-শ্রমিকের কাজ করে বেড়াবে—কে জানে!—এই দীর্ঘশ্বাস সত্যচরণের।